নেহরু বাল পুস্তকালয়
NEHRU
BAL PUSTAKALAYA
সরস গল্প
ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডি

নেহেরু বাল পুস্তকালয়—৪

সরস গল্প

লেখা : মনোজ দাশ
ছবি : মারিও

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

1970 (*Saka* 1892)
Reprinted 1981 (*Saka* 1903)
Reprinted 1986 (*Saka* 1907)

STORIES OF
LIGHT AND DELIGHT
(Bengali)

Translated by :
Lila Majumdar

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5, Green Park, New Delhi-110016 and printed at Saraswati Art Printers, 8247/2 New Anaj Mandi, Delhi-110006

রাজা আর কাঠ-বেড়ালি

অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ভারি অহঙ্কার যে তাঁর মতো উঁচু পদ আর কারো নেই। রাজার বয়স বেশি নয়, অনেক পড়াশুনোও করেছিলেন, ভারি বুদ্ধিমানও ছিলেন ; তাছাড়া বলে বা বীরত্বে তাঁর রাজ্যের কোনো যুবকই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারত না। তার উপরে সারা দেশে তাঁর মতো ধনী কেউ ছিল না।

একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে রাজা তাঁর বিচক্ষণ বুড়ো মন্ত্রীকে বললেন, "এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমার সামনে কেউ কখনো গর্ব করতে সাহস পাবে না। সব দিক দিয়ে সকলের চেয়ে আমি উত্তম বলে আমি খুব খুসি।"

যুবক রাজা যা বলতেন প্রায় সর্বদাই বুড়ো মন্ত্রীও সেটা সমর্থন করতেন। এবার কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। একটু হাসলেন না পর্যন্ত।

রাজা ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। "সে কি, মন্ত্রীমশাই, চুপ করে রইলেন যে?"

মন্ত্রী একটু মুচকি হেসে বললেন, "মহারাজ, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সামনে কেউ কখনো গর্ব করবে না, এ কথা কি সব সময় বলা যায়? বাস্তবিকই আপনি এ রাজ্যের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ, তবু কারো কারো পক্ষে সেটা না বোঝা অসম্ভব নয়। সকলেরি আত্মাভিমান আছে। অনেক সময়ই দেখা যায় যে অতিশয় দুর্বল সেও ভাবে তার মতো বীর যোদ্ধা বুঝি আর কেউ নেই। কাজে কাজেই এমনও হতে পারে যে একজন কেউ হয়তো আপনার শ্রেষ্ঠত্বর কথা না জেনে, আপনার সামনেই একদিন জাঁক করবে। অবিশ্যি, সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হবে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা। অন্য লোকের অহঙ্কারের দিকে নজর দিতে গেলে, নিজেরি মনের শান্তি নষ্ট হয়।"

মন্ত্রী কথা বলছেন, তারই মধ্যে ছোট্ট একটা কাঠ-বেড়ালি লাফিয়ে এসে, ওঁদের সামনেই একটা শ্বেত পাথরের থাম বেয়ে উপরে উঠে, সামনের থাবা দুটো উঁচু করে রাজাকে আর মন্ত্রীকে একটা মুদ্রা তুলে ধরে দেখাতে লাগল।

রাজার ভারি মজা লাগল। তাঁর মুখে মৃদু হাসি দেখে কাঠ-বেড়ালিটা সুর করে বলতে লাগল,

"আমার ঘরে টাকার কাঁড়ি, রাজার আছে কি !
আমার ধনের হিংসায় রাজা, জ্বলে মরছে, ছি !"

শুনে রাজা চটে কাঁই! মন্ত্রী কিছু বলবার আগেই তিনি তেড়ে গেলেন। কাঠ-বেড়ালিও টাকা ফেলে হাওয়া। রাজা টাকা তুলে, পকেটে ভরে, প্রসন্নভাবে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। মন্ত্রী কিন্তু কিছুই বললেন না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশে-পাশের অন্যান্য রাজ্য থেকে কয়েকজন দূত এসেছিলেন। রাজা আর মন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে বসে কতকগুলো জরুরী বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ মাথার উপর থেকে শোনা গেল সুর করে কাঠ-বেড়ালি বলছে,

"কিসের এত দেমাক রাজার, কার ধনে হয় ধনী !
আমার টাকা নিয়েছে রাজা, শুনছ যাদুমণি !"

শুনে রাজা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বেজায় রাগ হল, কিন্তু ঘরে সম্মানিত অতিথি, তাই রাগটা চেপে রাখতে হল। এদিকে কাঠ-বেড়ালি একটা থামের মাথা থেকে আরেকটা থামের মাথায় লাফ দিতে দিতে, বারবার ছড়া কাটতে লাগল। রাজদূতরা সবই শুনলেন, কিন্তু

পাছে রাজা কিছু মনে করেন, এই ভয়ে কেউ হাসলেনও না, কিছু বললেনও না।

অতিথিরা যে যার ঘরে গেলে, রাজা আঁতি-পাঁতি করে কাঠ-বেড়ালিটাকে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু তার ল্যাজের ডগাও দেখতে পেলেন না। রাজা এমনি রেগে গেলেন যে সারারাত চোখের তুপাতা এক করতে পারলেন না।

রোজ ভোরে রাজার দিনের কাজ শুরু হত গরীবদের ভিক্ষা দান করে। তার পর দিন ভোরে তিনি সবাইকে ভিক্ষা দিচ্ছেন, এমন সময় দরজার পাশে কাঠ-বেড়ালি এসে সুর করে বলতে লাগল,

"জাঁক করে রাজা বিলোচ্ছে ধন,
তাও যদি সে হত আপন!"

রাজা তাঁর অনুচরদের বললেন—ধর ব্যাটাকে। কিন্তু তাকে ধরবে কে, সে কি আর সেখানে থাকে! রাজা বেচারিকে আবার রাগ গোপন করতে হল।

কয়েক ঘণ্টা বাদে রাজা সবে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন, এমন সময়, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কাঠ-বেড়ালি গেয়ে উঠল,

"মজার কথা বলব কত, আমার টাকায় কেনা যত
চর্ব্য-চূষ্য গিলছে রোজ, রাজবাড়িতে নিত্যি ভোজ!

তাই শুনে রাজা এমনি চটে গেলেন যে আর এক গ্রাসও গিলতে পারলেন না। কাঠ-বেড়ালিকে ধরার চেষ্টায় অনুচররা ছুটো-ছুটি করতে লাগল। কিন্তু তার দেখা পেলে তবে তো ধরবে!

সে-দিন সন্ধ্যার মুখে রাজা সবে নৈশ-ভোজনে বসেছেন, এমন সময় কাঠ-বেড়ালি তাঁর সামনে দেখা দিয়ে, আবার সেই তুপুরবেলার ছড়াটা কাটতে লাগল।

তখন নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হওয়াতে, রাজা পকেট থেকে কাঠ-বেড়ালির টাকাটা বের করে, তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

কাঠ-বেড়ালিও অমনি টাকাটি তুলে নিল। কিন্তু চলে যাবার সময় সুর করে বলে গেল,

"কাঠ-বেড়ালির শক্তি দেখে রাজা পেলেন ভয়।
আমার টাকা ফিরিয়ে দিলেন। কাঠ-বেড়ালির জয়!"

পাগলের মতো রাজা তাকে তাড়া করে গেলেন। কিন্তু সে যে কোথায় গা ঢাকা দিল, আর তাকে দেখা গেল না। সে রাতেও রাজার চোখে ঘুম এল না। সারারাত কেবলি কাঠ-বেড়ালির কথাগুলো ফিরে ফিরে এসে তাঁকে যেন টিটকিরি দিতে লাগল।

সকালে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "ভাবছি সৈন্য সামন্ত ডেকে দেশের যত কাঠ-বেড়ালি সব মেরে ফেলার হুকুম দিই। আর তো কোনো উপায় দেখি না।

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আপনার রাগের কারণ খুবই বুঝি। কিন্তু আমাদের সেপাইরা এই দেশে যত কাঠ-বেড়ালি আছে সব কটাকে যে মারতে পারবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? কে জানে হয়তো আমাদের শস্যের ক্ষেতে, দুর্ভেদ্য ঘন বনে, উঁচু পাহাড়ের-চূড়োয়, লক্ষ লক্ষ কাঠ-

বেড়ালি লুকিয়ে আছে। তাছাড়া এদেশে ঢুকতে হলে কাঠ-বেড়ালিদের তো আর প্রবেশ-পত্র লাগে না। পাশের রাজ্যগুলো থেকে পিল-পিল করে আমাদের রাজ্যে কাঠ-বেড়ালি ঢুকতেই বা বাধা কি? আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধে যতই বীরত্ব দেখাক না কেন, কাঠ-বেড়ালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললে তারা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ হবে। বিশেষ করে যখন দেখবে তারা তেমন সুবিধা করতে পারছে না। তাছাড়া ধরুণ দৈব-ক্রমে যদি যে কাঠ-বেড়ালিটা আপনাকে এত জ্বালাচ্ছে, সে-ই বেঁচে যায়? তাহলে এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। উপরন্তু, দেশের লোকরাই বা কি বলবে? আর ঐতিহাসিকরা-ই বা কি লিখবে? তখনকার ছাত্ররা যখন তাদের বইতে পড়বে 'একদা এক রাজা ছিলেন। তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাঠ-বেড়ালিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন।' তখন কি মজা হবে বলুন দেখি!"

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "তা হলে করবটা কি?" "কেন মহারাজ, ওকে স্রেফ উপেক্ষা করুন। ব্যাটা যখন বাগানে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তখনি যদি ওর দিকে না তাকাতেন, কিম্বা অত রেগেমেগে না
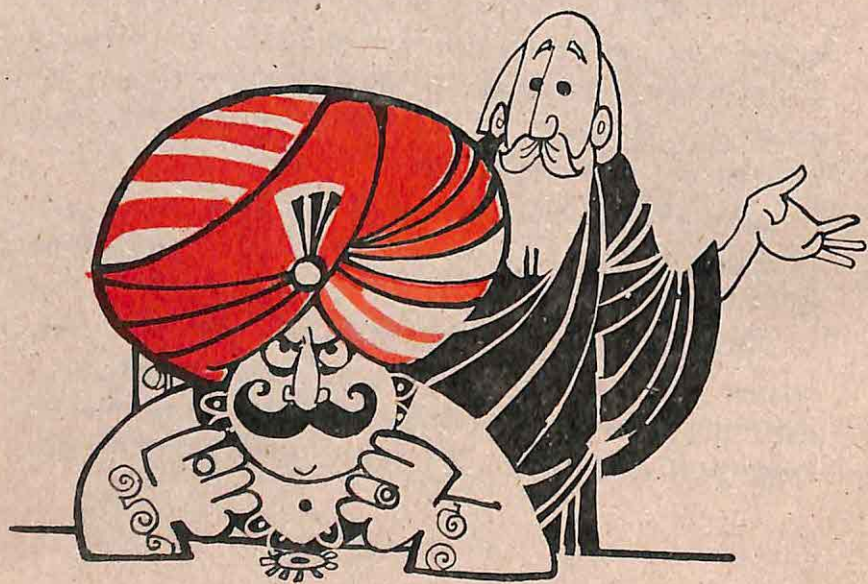
গিয়ে যদি ওর ঐ অর্থশূন্য জাঁকের কথা চুপ করে শুনে যেতেন, তা হলে তো আপনাকে এত কষ্ট পেতে হত না। সে যাই হক, হাল-চাল বদলাবার সময় কখনো চলে যায় না।"

কিছুক্ষণ পরেই কাঠ-বেড়ালি আবার রাজার কাছে এসে সেই ভয় পেয়ে টাকা ফেরত দেবার ছড়াটা সুর করে বলতে লাগল। রাজা যেমন ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। উল্টে একটু মুচকি হেসে নরম গলায় বললেন,

"কে না জানে কাঠ-বেড়ালি সদাই সু-মহান।
কোথায় লাগে রাজা-রাজড়ার ধন-বিদ্যা-মান!
বলে মুরগি যেই না হাই তুলেছে,
সাগর তলিয়ে যান!"

তাই শুনে কাঠ-বেড়ালি হাঁ! অবাক হয়ে রাজার দিকে একটি বার তাকিয়ে, কোনো কথা না বলে, অমনি চোঁ-চাঁ দৌড়। সে রাজ্যে আর কখনো তার ল্যাজের ডগাটিও দেখা যায় নি।
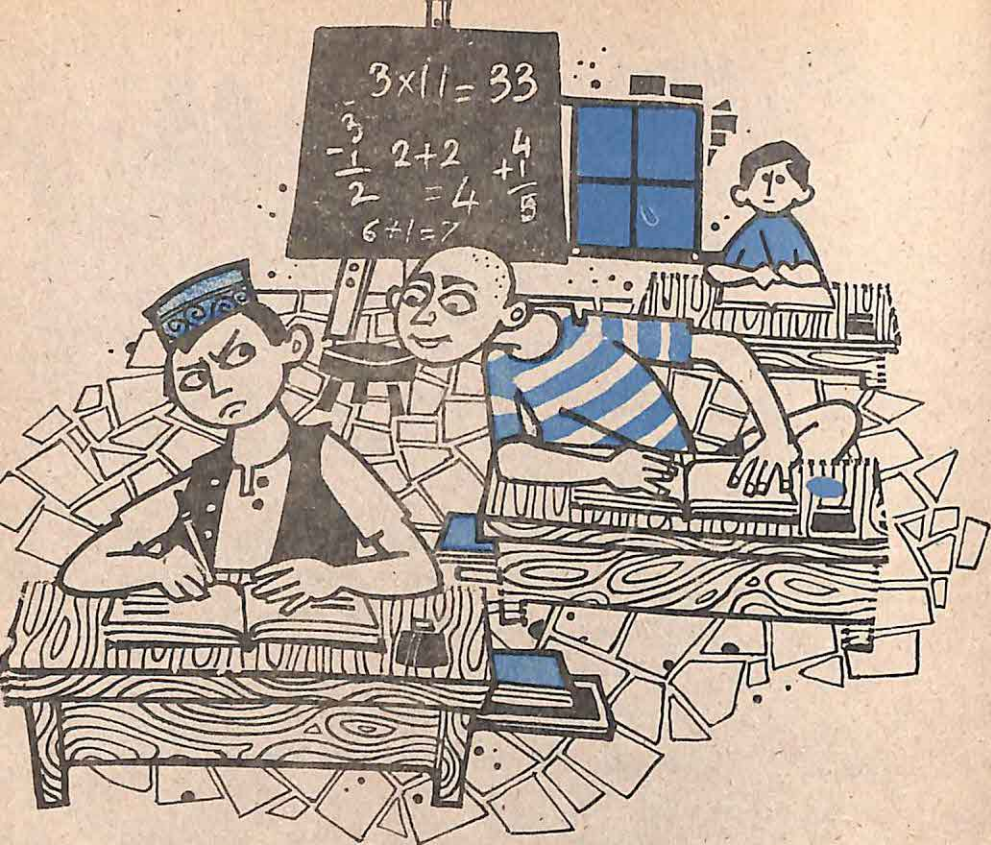
কানে কানে কথা

অনেক অনেক বছর আগে একটা ছোট গ্রামে দুটি ছেলে থাকত, রঘু আর রাজু। একই বয়স তাদের, একই স্কুলে পড়ত।

রঘু বড় ভালো ছেলে, খাটত-ও খুব। তার মা-বাবা আর শিক্ষক মশাইরা তার বিষয়ে ভারি গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু রাজু ছিল অন্য রকম। তার যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সৎ-বুদ্ধি একটুও ছিল না। পরীক্ষার সময় সে জোচ্চুরি করত, অন্য ছেলেদের খাতা দেখে লিখত। নিজেকে ছাড়া সে কাউকে ভালবাসত না, তবু মেকি হাসি আর মিষ্টি কথা দিয়ে লোক ভুলোতে ওস্তাদ ছিল।

রঘুর উপর সে বেজায় চটা ছিল, কারণ রঘু তাকে সাহায্য করতে রাজি হত না। চুরি জোচ্চুরি করার সময় সে প্রায়ই রঘুকে ডাকত। কিন্তু রঘু সর্বদা বলত, "ভালো কাজে আমাকে ডাকলে, আমি নিশ্চয় সাহায্য করব। কিন্তু মন্দ কাজে আমি তোমার সঙ্গী হব না।"

লেখা-পড়া শেষ করে, রাজু গ্রাম ছেড়ে একটা বড় শহরে থাকতে গেল। রঘু সাদাসিধে ভাবে গ্রামেই থেকে গেল। বাপের কাছ থেকে পাওয়া কয়েক বিঘা জমি ছিল, সে তার-ই দেখাশুনো করত। গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করত আর ভালোবাসত।

অনেক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে রঘুর সঙ্গে রাজুর একবারও দেখা হয় নি, দেখা হবার কোনো সুযোগও ঘটে নি। তারপর একদিন রঘুর কানে এল যে দেশের রাজা রাজুর বুদ্ধি দেখে খুসি হয়ে, তাকে প্রধান মন্ত্রী করেছেন। তাই শুনে রঘু খুব সন্তুষ্ট হল না, কারণ সে তো জানত রাজু কত অসৎ। তবে তাই নিয়ে সে মন খারাপও করল না, কারণ অন্যের ব্যাপার নিয়ে সে বড় একটা মাথা ঘামাত না।

তারপর একদিন রঘুকে শহরে যেতে হল। গ্রামে একটা বিশেষ উৎসব, কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। দুপুরে সে গিয়ে শহরে পৌঁছল। বেজায় গরম ; রঘু যেমনি ক্লান্ত, তেমনি তার জল তেষ্টাও পেয়েছিল।

সামনেই একটা মস্ত প্রাসাদ দেখে সে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। চাকরের কাছে এক গেলাস জল চাইবে, এমন সময় বাড়ির মালিক এলেন। তাকে দেখেই অবাক হয়ে তিনি বললেন, "আরে রঘু যে! তুমি এখানে কি করছ?" অনেক কষ্টে রঘু রাজুকে চিনতে পারল। তার পরনে এখন জমকালো পোষাক। সে পা ফেলতেই মিহি রেশমের জাব্বা-জোবা ভাঁজে ভাঁজে ঝলমল করে দুলে উঠল। রোদ লেগে সোনার হার, হীরের আংটি জ্বলজ্বল করতে লাগল। মাথায় সোনা রূপোর কাজ করা ঝকঝকে পাগড়ি, তার ঠিক মাঝখানে এই বড় একটা নীলা থেকে আলো ঠিকরোতে লাগল। তার উপর রাজু একটা পিপের মতো মোটা গোল হয়ে উঠেছিল।

রঘু রাজুকে নমস্কার জানাল। রাজু তার উত্তর দিল না। তার

বদলে যেন কতই সহানুভূতি দেখিয়ে বলে উঠল, ইস্, কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার, রঘু। কি যাচ্ছেতাই কাপড়চোপড় পরেছ! বোধ হয় সারা পথ হেঁটেই এসেছ? বড়ই দুঃখের কথা যে ঘোড়া না হক, একটা খচ্চর পর্যন্ত জোটাতে পার নি। আমাকে দেখ। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তাই দেখ। রাজার মতো লাগছে না? আমার পোষাক দেখ, আমার বাড়িঘর দেখ। এসব দেখে দেবতারা পর্যন্ত হিংসায় জ্বলে যান। স্রেফ নিজের গুণে আমি আমার অবস্থার এত উন্নতি করে ফেলেছি। এদিকে তুমি এমনি আহাম্মুক যে একটা খচ্চর পর্যন্ত কিনতে পার নি।

রঘু বলল, "হতে পারে আমি গরীব, কিন্তু আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আর তুমি তো খুব ভাল করেই জান যে আমি আহাম্মুক নই। ইচ্ছা করলেই আমিও তোমার মতো পয়সা-কড়ি আর ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি। কিন্তু তুমি যে উপায়ে হয়েছ, সেটা আমি ঘৃণা করি।"

রাজু রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "চোপ রাও! অতই যদি ক্ষমতা রাখ তো আমার বাড়িতে ভিক্ষা করতে এসেছ কেন?"

রঘু বলল, "ভিক্ষা করতে তো আসিনি। জল তেষ্টা পেয়েছিল, তাই এক গেলাস জল চাইতে এসেছিলাম। এটা যে তোমার বাড়ি—তাও আমি বুঝতে পারিনি।"

রাগে রাজুর গলা কাঁপতে লাগল। "এখানে এক ফোঁটাও জল পাবে না। যাও এখান থেকে।"
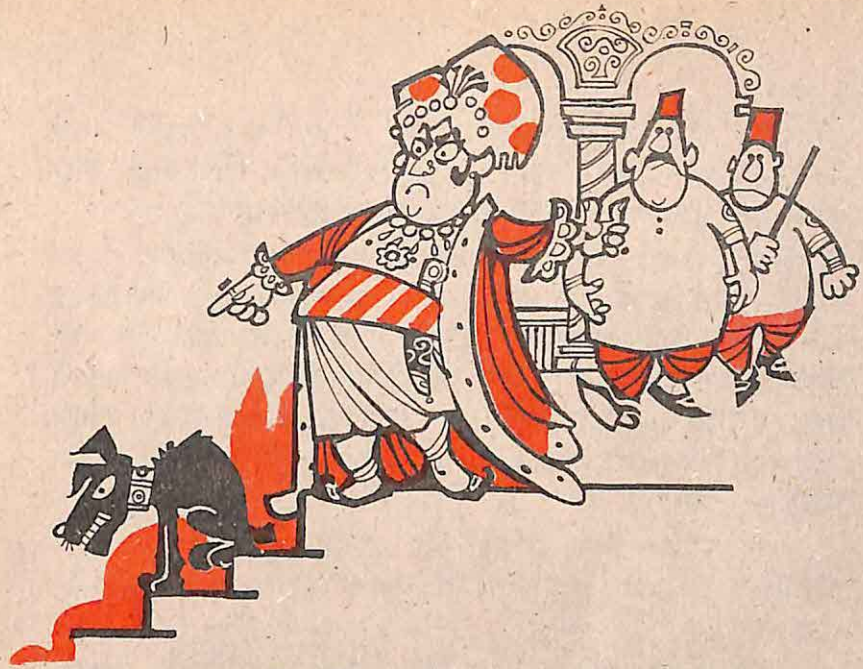
ঠাণ্ডা গলায় রঘু উত্তর দিল, "ঠিক আছে, ভায়া, আমি চললাম।"

এতে রাজুর মন উঠল না। সে তার দুজন চাকরকে বলল রঘুকে চ্যাং-দোলা করে তুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে। এবার রঘু-ও রেগে গেল। "দেখ, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করি নি। আমাকে যদি মিছিমিছি অপমান কর, তার ফল ভালো হবে না বলে রাখলাম।"

রাজু চ্যাচাতে লাগল, "অনিষ্ট করনি বলতে চাও? পরীক্ষার সময় সাহায্য করতে অস্বীকার কর নি? তবে? আশ মিটিয়ে এবার তোমাকে অপমান করব। তুমি আমার কি করতে পার? আমাকে সাজা-ও দিতে পারবে না। কেন না আমি রাজার প্রধান মন্ত্রী। অন্য সব মন্ত্রীদের আমিই বহাল করেছি। রাজার প্রধান সেনাপতি আমার বন্ধু, অর্থসচিব আমার শ্বশুর মশাই, প্রধান বিচারপতি আমার শ্যালা। এবার বুঝলে তো?"

রাজুর চাকররা রঘুকে ধরে রাস্তায় ফেলবার সময়, রঘু শুধু বলল, "তোমাদের সক্কলের শোচনীয় পরিণাম হবে।"

এর কয়েক মাস পরে, রাজা একলা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় একজন দাড়ি-ওয়ালা অচেনা লোক এসে হাজির। রাজাকে নানারকম সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়ে, সে বলল, "মহারাজ, রোজ আমি গোপনে

আপনাকে পঞ্চাশটা করে সোনার মোহর দিয়ে যাব। তার বদলে কিন্তু রোজ আপনি যখন সভায় বসবেন, আমাকে আপনার কানে কানে কয়েক মুহূর্ত ধরে আমার যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে দেবেন।"

রাজা বললেন, "বেশ তো, এতে আমি কোনো দোষ দেখি না।" তার পর দিন রাজা সভায় বসেছেন। মন্ত্রীরা আর রাজ কর্মচারীরা তাঁকে ঘিরে বসেছেন, এমন সময় সেই অচেনা লোকটি সবাইকে ঠেলেঠুলে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। রাজা হেসে তাকে কাছে ডাকলেন। লোকটি তাঁর খুব কাছে এসে, প্রায় কানে ঠোঁট লাগিয়ে ফিস-ফিস করে বলল, "কি খাসা দিন করেছে আজ। কেমন চনচনে রোদ, আকাশে মেঘের চিহ্নটুকুও নেই।"

বলল তো এই, কিন্তু বলবার সময় লোকটা বারবার রাজুর দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর রাজার পকেটে পঞ্চাশটা মোহর গুঁজে দিয়ে সে সরে পড়ল।

প্রধান মন্ত্রী রাজু-ও অমনি তার পিছন পিছন গিয়ে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "মহাশয়, আপনি রাজার সঙ্গে কি বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ? আর আমার দিকেই বা বারবার তাকাচ্ছিলেন কেন ?"

আসলে লোকটি ছদ্মবেশী রঘু ছাড়া আর কেউ নয়। সে আগে থেকেই ভেবেছিল ঠিক এমনি-ই হবে। সে বলল, "রাজার সঙ্গে আমার গোপন কথা আপনাকে বলব কি করে ?"

রাজুর ভয় দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে রঘুর পায়ের কাছে একশো মোহর রেখে বলল, "সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে আরো একশো মোহর দেব, শুধু দয়া করে বলুন কি গোপন কথা হল।"

রঘু ভাব দেখাল যেন তার কতই আপত্তি। তবু রাজু খানিক পেড়াপিড়ি করার পর বলল, "ব্যাপার খুব গুরুতর। অনেক লোক রাজাকে জানিয়েছে যে আপনি ঘুষখোর এবং অসৎ। তাই তিনি আমাকে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে বলেছেন।" শুনে রাজুর বেজায় ভাবনা হল। ব্যাকুল-ভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "মহাশয়, আজ তাঁকে আপনি কি বললেন ?"

রঘু বলল, "বললাম, আমি এখনো তদন্ত করছি।"

রাজু বলল, "আমার উপর দয়া করুন, মহাশয়। আমি আপনাকে আরো এক হাজার মোহর দেব।

রঘু গম্ভীর মুখে বলল, "দেখি কি করতে পারি।"

তারপর দিন আবার রঘু রাজ-সভায় গিয়ে রাজার কানে কানে বলল, "আজ ভোরে বেজায় জোরে উত্তুরে বাতাস বইছিল। এখন মনে হচ্ছে হাওয়াটা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসছে।" কথাগুলো বলবার সময় রঘু বারবার রাজুর দিকে তাকাচ্ছিল। রাজা এমন বাজে কথা শুনে একটু মুচকি হাসলেন। এই সামান্য উপকার-টুকুর জন্য রোজ পঞ্চাশটা সোনার মোহর পেয়ে তাঁর মেজাজ বড় খুসি।

জালে পড়লে মাছের যেমন অবস্থা হয়, রাজুর মনের-ও হল তাই।

আবার সে রঘুর সঙ্গে দেখা করল। রঘু বলল যে আপাততঃ রাজার বিশ্বাস হয়েছে যে তাঁর প্রধান মন্ত্রী এখনকার মতো কোনো অন্যায় কাজ করেনি। রাজু তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এক হাজার মোহর দিল।

তারপর দিন রঘু যখন রাজার কানে কানে বাইরের কুয়াশা আর ঝির ঝির বৃষ্টির কথা বলছিল, তখন তার চোখ যাচ্ছিল বারবার প্রধান সেনাপতির

দিকে। ফলে প্রধান মন্ত্রী যেমন যেমন করেছিল, প্রধান সেনাপতিও ঠিক তাই করল। রঘুও আরো এক হাজার সোনার মোহর পেল।

এই ব্যাপারের পর কয়েক দিনের মধ্যে রঘু সমস্ত মন্ত্রীদের, অর্থ-সচিবের আর শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির মনেও ভয় ধরিয়ে দিতে পারল। রোজ রাজাকে যে পঞ্চাশটি মোহর দিতে হত, তার বদলে দেখতে দেখতে রঘুর দশ হাজারের বেশি মোহর জমে গেল।

তারপরে একদিন, সভা ভরতি লোক, সভাসদ্‌রা, কর্মচারীরা, প্রজারা সবাই উপস্থিত, এমন সময় রঘু এসে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মহারাজ, এতদিন আমি আপনার কানে কানে শুধু বাজে কথাই বলেছি। আজ কিন্তু এই থলি থেকে কিছু কাজের জিনিস বেরুবে।"

এই বলে রাজার সামনে রঘু একটা রেশমি থলি ফেলে দিল। দশ হাজার সোনার মোহরের ঝন-ঝনানি রাজার কানে বড় মধুরভাবে বাজল। রাজা একটু হাসলেন। তাঁর মনে হল অচেনা লোকটা একটু যেন খ্যাপাটে। তবু বললেন, "ব্যাপারটা একটু বুঝিয়েই বলুন না।"

রঘু তখন সব কথা বলে দিল। তারপর মোহরগুলোর দিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ দেখুন আপনার চারদিকে যে কি রকম মিথ্যার জাল জড়িয়ে আছে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ। প্রধান মন্ত্রী আর অন্যান্য মন্ত্রীরা যদি সৎলোক

হতেন, সেনাপতি যদি সত্যই কর্ত্তব্য পরায়ণ হতেন, অর্থ-সচিব আর প্রধান বিচারপতি যদি ঘুষ না নিতেন, তা হলে তাঁদের দিকে আমি একটু তাকিয়েছি বলেই তাঁরা ভয়ে আধ-মরা হয়ে যেতেন না।"

রাজাও তখনি বুঝলেন যে তাঁর কর্মচারীরা কেউই তাদের পদের যোগ্য নন। সবাই অসৎ। তাদের কারো বিবেক নির্মল নয়। নিজেদের দোষের কথা তারা জানে বলে তাদের সদাই ভয়। অনেক প্রতারণা করে আর মিথ্যার সাহায্য নিয়ে, রাজু আর তার বন্ধুরা নিজেদের যে-সব সম্মানের পদে বসিয়েছিল, নিমেষের মধ্যে সে সব ঝুর্-ঝুর করে ভেঙ্গে পড়ল।

রাজা রঘুকে প্রধান মন্ত্রী করে দিলেন। অল্প দিনের মধেই রঘু একদল সৎ আর পরিশ্রমী লোক বেছে আনল। তারা রাজ-সভার ঐ সব শূন্য পদে অধিষ্ঠিত হল। ততদিনে রাজারও অনেক বুদ্ধি বেড়েছিল।
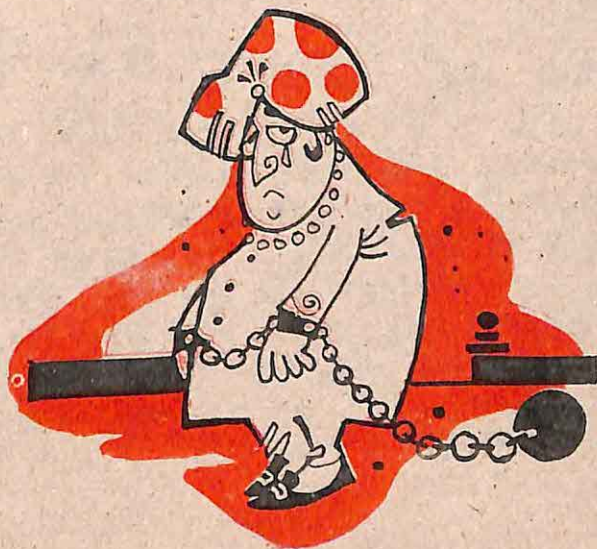
আজব দেশে ভ্রমণ

অনেক দিন আগে, অনেক দূরের এক দেশে, এক বুড়ো সওদাগর আর তার ছেলে থাকত। ছেলের নাম অর্জুন। একদিন বুড়ো বলল, "বাবা, এই দেখ্ খুব উঁচু জাতের দুটি ঘোড়া। এদের আমি বড় যত্ন করে লালন-পালন করেছি। জান তো যে সব দেশে ভালো ঘোড়া বেশি পাওয়া যায় না, সেখানে এদের একেকটিকে অন্ততঃ একশো সোনার মোহর দিয়ে বিক্রি করা যায়। এখান থেকে অনেক দূরে, দক্ষিণ দিকে, ঐ রকম একটি দেশ আছে। আমি বুড়ো হয়েছি, অত দূরে যাবার আমার সাধ্য নাই। কিন্তু তোমার যদি সাহসে কুলোয়, তা হলে অচেনা সব দেশের ভিতর দিয়ে, বহু দূরে যাত্রা করে, এই ঘোড়া দুটিকে তুমি সেই দক্ষিণ দেশের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পার। তিনি হয়তো তার চেয়েও বেশি মূল্য দিতে রাজি হবেন।

দূর দেশে ভ্রমণ করার কথা শুনে অর্জুনের উৎসাহ দেখে কে! কিন্তু তার বাবা তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে বললেন, "মনে রেখো, কখনো পশ্চিম-মুখো যাবে না। যদি যাও, এমন একটি দেশে গিয়ে উঠবে, যেখানকার লোকেরা সবাই ভারি দুষ্টু। অক্ষত অবস্থায় কোনো বিদেশী আজ পর্যন্ত সেখান থেকে ফিরে আসেনি। আমিও একবার গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই আহাম্মুকির জন্য আমাকে এত বেশি দাম দিতে হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত সে-কথা ভুলতে পারি নি।"

অর্জুন তখন বাবাকে পেড়াপিড়ি করতে লাগল পাজিদের দেশে গিয়ে কি হয়েছিল, সে-কথা বলতেই হবে। বুড়ো বলল, "মনে আছে ছোটবেলায় তোমার এক দাদার সঙ্গে খেলা করতে? পনেরো বছর আগে একবার আমি বাণিজ্যে বেরিয়ে, অনেকগুলো দেশ ঘুরেছিলাম। তোমার দাদার তখন চোদ্দ বছর বয়স, তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দেশ-বিদেশ দেখলে, সেখানকার লোকেরা কি ভাবে থাকে লক্ষ্য করলে, তার খুব ভালো শিক্ষা হবে।

ফিরবার পথে, দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা অচেনা দেশে এসে পড়লাম। সন্ধ্যার দিকে পৌঁছলাম, সে-রাতটা ওখানকার একটা সরাইখানায় কাটালাম। ওখানকার লোকদের কথাবার্তা শুনে আর ভাব-গতিক দেখে বুঝলাম ভুল করে আমরা সেই পাজিদের দেশে পৌঁছেছি, যার বিষয় ভ্রমণকারীরা আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে থেকে রওনা হয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

পর দিন ভোরে সরাইখানার মালিককে টাকা দিচ্ছি, এমন সময় তার ভাই দৌড়ে এল। এসেই নিজের মন্দ কপাল নিয়ে সে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তার উপর সে বলল যে তার স্ত্রীর মরা ছেলে হয়েছে এবং তার জন্য আমি-ই নাকি দায়ী। শুনে আমি অবাক। ব্যাটা বলে কি না আগের দিন আমি যখন ঘোড়া থেকে নামছিলাম, তখন আমি নাকি ফোঁস-ফোঁস করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিলাম। সেই সময় একটা খুদে পোকা সরাইখানার ভিতর থেকে উড়ে বেরিয়ে আসছিল। আমার নিশ্বাসের হাওয়া লেগে পোকাটা অন্য দিকে উড়ে গেছিল। দোতলার

একটা ঘরে সরাইখানার মালিকের ভাই-বৌ বসেছিল। তার ছেলে হবার কথা। পোকাটা উড়ে এসে সটাং তার নাকের ফুটোয় ঢুকে গেল। তার ফলে সে এমনি হাঁচি দিল যে তার ছেলেটি জন্মাবার আগেই মরে গেল। এইরকম একটা বাজে অভিযোগের কোনো উত্তর দেবার আগেই দেখি চারদিকে ভিড় জমে গেছে। সবাই সেই লোকটাকে সমর্থন করতে লাগল। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তারা আমার ছেলেকে কেড়ে নিল, কারণ তাদের মতে ঐ মরা ছেলে জন্মানোর জন্য আমি-ই দায়ী। আজ পর্যন্ত বোধ হয় আমার ছেলে বেচারী ওদের ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে।"

এই ঘটনার কথা বলবার সময় বুড়ো তো কেঁদে আকুল। বাবার দুঃখ দেখে অর্জুনেরও মন খারাপ হয়ে গেল। সে আশ্বাস দিয়ে বলল, "নিশ্চিন্ত থাক, বাবা, পাজির দেশে আমি কখনো যাব না।"

সেই চমৎকার ঘোড়া দুটিকে নিয়ে অর্জুন তো সুদূর দক্ষিণ দেশের দিকে রওনা হয়ে গেল। কয়েক দিন পরে সে একটি নদীর তীরে এসে পৌঁছল। নদীতে বান ডেকেছে, খেয়া-মাঝি কিন্তু তার খুদে নৌকোতে ঘোড়া দুটোকে কিছুতেই নিতে রাজি হল না। সে বারবার বলতে লাগ অর্জুন যদি পশ্চিম দিকে একটু এগিয়ে যায়, তা হলে আরেকজন মাঝিকে পাবে। তার নৌকো এটার চেয়ে অনেক বেশি মজবুৎ।

অর্জুন তখন পশ্চিম দিকে চলল। হঠাৎ বেজায় ঘুর্ণি-ঝড় উঠল। বৃথাই চারদিকে সে আশ্রয় খুঁজল। তারপর চোখে পড়ল কাছেই একটা পাহাড়ের পিছন দিক থেকে ধোঁয়া উঠছে। অনেক কষ্টে ঘোড়া দুটোকে সামলিয়ে, অর্জুন সেই পাহাড়ে চড়ল।

সবে ঝড় শান্ত হয়েছে, এমন সময় নিচের দিকে তাকিয়ে অর্জুন একটা গ্রাম দেখতে পেল। পশ্চিম দিকে অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছে বলে, অর্জুনের মনে হল ঐ গ্রামটা হয়তো পাজিদের দেশের গ্রাম।

একবার ভাবল ফিরে যাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল সামলাতে পারল না। এই বিখ্যাত দেশের লোকগুলো না জানি কেমন। ভালো করে ঠাওর করার জন্য অর্জুন পাহাড়ের ধার দিয়ে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। সেখানে একটা আলগা পাথরের উপর পা হড়কে, হুড়মুড়

করে পড়বি তো পড়, একেবারে সেই গ্রামে গিয়ে সে পড়ল। ঘোড়া ছুটিও এক দৌড়ে নেমে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

ঐ পথ দিয়ে একটি বুড়ো যাচ্ছিল, সে-ও দৌড়ে এল। অর্জুন উঠে দাঁড়াল। ভাগ্যিস্ বেশি জখম হয় নি। সে যাই হক, বুড়ো তাকে খুব নজর করে দেখছে লক্ষ্য করে, অর্জুন খুসি-ই হল। মনে মনে বলল, "যাক, এই পাজিদের দেশেও এমন লোক আছে, যারা অন্যদের জন্য ভাবিত হয়।"

সবে অর্জুন বুড়োকে তার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানাতে যাবে, এমন সময় বুড়ো মহা কঁ্যাও-ম্যাও জুড়ে দিল। সে নাকি লক্ষ্য করেছে যে অর্জুনের চাপে একটা ব্যাঙ মরে গেছে। বুড়ো কেবলি কাঁদতে আর বিলাপ করতে লাগল, "ওরে আমার মিষ্টি ব্যাঙের ছানারে! ওরে আমার বাছারে! কি করে তোর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিই, বল্!"

তার কান্নাকাটি শুনে বহু গ্রামবাসী এসে হাজির হল। তারা কি এক অদ্ভুত ভাষায় বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তারপর অর্জুনের দিকে ফিরে তারা বলল যে বুড়োর ছেলেপুলে নেই বলে নাকি সে ঐ ব্যাঙটাকে পুষ্যি নিয়েছিল। বাপের প্রতি পোষা ব্যাঙের কর্তব্যজ্ঞান আর ভক্তির কথা সবাই জানত। দেশের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাঙের মৃত্যুতে বুড়ো যে নিতান্ত ভগ্ন হৃদয় আর শোকগ্রস্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

দেখতে দেখতে গ্রামের অনেকগুলো লোক-ও বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে কান্না জুড়ে দিল। অর্জুন কি যে করবে ভেবে পেল না। শেষটা সে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করল কি করলে বুড়ো সান্ত্বনা পাবে।

বুড়ো নিজেই হঠাৎ বলে উঠল, "ঘোড়া দুটোর একটা আমাকে দাও।"

অর্জুন রেগে গেল। "সে কি কথা! ব্যাঙের বদলে ঘোড়া!" বুড়ো বলল, "বাছা, তোমার কথার মানে বুঝলাম না। পুত্রের চেয়ে কখনো ঘোড়ার দাম বেশি হতে পারে?"

শেষ পর্যন্ত সওদাগরের ছেলে দুষ্টু লোকটাকে একটা ঘোড়া দিয়ে দিতে বাধ্য হল। বিমর্ষ মনে সে গ্রাম ছেড়ে চলল। আরেকবার

পাহাড় চড়া মুস্কিল দেখে সে কিছু দূর হেঁটে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল ও-দিকে যাবার অন্য পথ পাওয়া যায় কিনা।

একটু পরেই পাহাড়ের পায়ের কাছে সে আরেকটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। বেজায় ক্ষিদে তেষ্টা পেয়েছিল। সামনেই যে বাড়ি পেল তার দরজায় গিয়ে সে টোকা দিল। একজন এক-চোখো লোক সাড়া দিল। অর্জুন তার কাছে কিছু খাবার আর জল চাইল।

এক-চোখো বলল, "খাবার তো দিতে পারব না। তবে পেট ভরে জল খেতে দিতে পারি। অবিশ্যি পেট ভরা নিয়ে কথা, বল তাই কি না?"

অর্জুন জল খেয়ে, লোকটাকে ধন্যবাদ দিল। সবে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন সময় এক-চোখো লোকটা জানতে চাইল সে কোথা থেকে এসেছে, তার বাপের নাম কি। যেই না অর্জুন তাকে সে-কথা বলেছে, অমনি লোকটা তার হাত ধরে বলে উঠল, "অবশেষে পেলাম তোমাকে! শোন, ছোকরা। কুড়ি বছর আগে তোমাদের দেশে ব্যবসা করতে গেছিলাম। দুঃখের বিষয় আমার সব পয়সাকড়ি চুরি হয়ে গেছিল। তোমার বাবাকে খুব ভাল করেই চিনতাম। তাঁর কাছে দুটি মোহর চাইলাম। তিনি বললেন দেবেন, কিন্তু একটা কিছু বন্ধক রাখতে হবে। আমার সঙ্গে কিছুই ছিল না। তাই তোমার বাবা বললেন আমার একটা চোখ জমা রেখে যেতে। আমার তখন এতই টাকার দরকার যে তাতেই রাজি হলাম। তোমার বাবা আমার একটা চোখ তুলে রেখে নিলেন। বলেছিলেন এক বছর বাদে এ-দেশে এসে চোখটা ফিরিয়ে দেবেন। তার জায়গায় কুড়ি বছর হয়ে গেছে। এবার তোমাকে পেয়েছি। দাও শীগগির আমার চোখ। বাপের ঋণ ছেলে শোধ করতে বাধ্য। আমি সেই দুটো মোহর আর সুদ হিসেবে আরেকটা মোহর দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমাকে আমার চোখ ফিরিয়ে দিতে হবে।"

দেখতে দেখতে এক-চোখো লোকটা বেশ কয়েকজন দলের লোক জোগাড় করে ফেলল। অর্জুন প্রায় কেঁদে ফেলে। সে বলল, "তোমার চোখ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবু বল কি করলে আমাকে তোমরা ছেড়ে দেবে?"

এক-চোখো বলল, "তুমি এখনি যেতে পার, তবে ঘোড়াটা রেখে।

অর্জুনকে এ ঘোড়াটাও রেখে চলে যেতে হল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার ফলে তার সারা গায়ে ব্যথা। তার উপর অমন চমৎকার ঘোড়াদুটোকে হারিয়ে মনেও বড় ব্যথা। একটা গাছের তলায় বসে সে কাঁদতে লাগল।

একজন যুবক সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে? কাঁদছ কেন?" অর্জুন কোনো উত্তর দিল না। এদেশের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতেই তার ভয় ধরে গিয়েছিল। অপরিচিত লোকটিও কিছুতেই ছাড়বে না। তাকে দেখে বড় দয়ালু বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত অর্জুন সংক্ষেপে তার ঘোড়া হারানোর কথা তাকে জানাল। লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "চল, রাজার কাছে যাই। আমি তোমার ঘোড়া ফিরে পাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

গোড়ায় অর্জুন একটু ইতস্ততঃ করেছিল। তারপর মনে পড়ল হারাবার মতো আর তো কিছু বাকি নেই। কাজেই সেই অচেনা লোকটির সঙ্গে সে রাজ বাড়িতে চলল। যাবার পথে সে রাজার কাছে গিয়ে কি বলতে হবে না হবে, অর্জুনকে শিখিয়ে দিল।

অর্জুনের নালিশ শুনে রাজা বুড়োকে আর এক-চোখোকে তলব করলেন। তার পর বিচার শুরু হল। বুড়ো বলল নাকি মরা ব্যাঙটা তার পুষ্যি ছেলে ছিল। অর্জুন অমনি তার পাগড়ির ভিতর থেকে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ বের করল। তারপর রাজার দিকে ফিরে সে বলল,

"মহারাজ, আমিও সবে মাত্র এই ব্যাঙটিকে পুষ্যি নিয়েছি। আমি প্রস্তাব করছি এই ব্যাঙকে সেই পাহাড়ের নিচে রাখি আর ঐ বুড়ো পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে আমার ব্যাঙ-ছেলের উপর পড়ে, তাকে মেরে ফেলুক।"

রাজা সম্মত হলেন। "ঠিক তো, এই তো সুবিচার। এর ন্যায্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বুড়োর সমস্যার এই হল উপযুক্ত সমাধান।"

বুড়োটা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। কোনো কথা না বলে সে অর্জুনের ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবার এক-চোখোর নালিশের পালা। নিজের পক্ষ নিয়ে অর্জুন বলল, "মহারাজ, আমার বাবার নিঃসন্দেহ অদ্ভুত সব খেয়াল ছিল। তার একটা হল লোকের চোখ সংগ্রহ করা। আমাদের গুদোম-ঘরে হাজার হাজার চোখ জমা আছে। আমি এই ভদ্রলোকের চোখ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ওঁর এই চোখটা নিয়ে গিয়ে মিলিয়ে না দেখলে তো আর ওঁর আগের চোখটা খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমি প্রস্তাব করছি ওঁর বাকি চোখটাও আমি উপড়িয়ে নিয়ে যাই। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই দুটো চোখই আস্ত অবস্থায় দিয়ে যাব।"

রাজা বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।" বলা বাহুল্য তাই শুনে এক-চোখো তখনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিল। হারানো চোখ সম্বন্ধে সে আর কোনো আগ্রহ দেখাল না।

তখন সেই অচেনা যুবক অর্জুনকে বলল, "তোমার সঙ্গে আমাদের দেশের সীমানা পর্যন্ত আমি যাব। তা হলে আর কেউ যে তোমার উপর উৎপাত করবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

পথে যেতে যেতে কথাবার্তায় অর্জুন বুঝল এই যুবকটি তার সেই হারানো

দাদা ছাড়া আর কেউ নয়। সেই পাজি লোকটা আর তার স্ত্রী তাকে এতদিন ক্রীতদাস করে রেখেছিল। সম্প্রতি সে মরেছে। সেই থেকেই দাদা দেশে ফেরার সুযোগ খুঁজছিল। এতকাল এদেশে থেকে এদের চালাকি সব তার জানা হয়ে গেছিল, কাজেই তাদের সঙ্গে কি ভাবে কারবার করতে হয় তাও তার জানতে বাকি ছিল না।

দুই ভাই এক সঙ্গে পাজির দেশ ছেড়ে চলে গেল। দক্ষিণ দেশে গিয়ে, খুব ভালো দামে ঘোড়া বিক্রি করে, তারা দেশে ফিরে এল। দুই ছেলে ফিরে পেয়ে বুড়ো বাপ বললেন তাঁর মতো সুখী এই ধরাধামে আর কেউ নেই।

রাজামহাশয়ের স্বর্গ যাত্রা

এক মোটা হাঁদা রাজার ছিল এক শুঁটকো মন্ত্রী। মন্ত্রী বলে বেড়াত তার নাকি বেজায় বুদ্ধি; এদিকে রাজার খোশামুদী করেই তার সময় কাটত। রাজার ধারণা যতক্ষণ এই বিচক্ষণ মন্ত্রীটি তাঁর পাশে আছে, ততক্ষণ তাঁর চিন্তা করবার কিছু নেই।

প্রায়ই তিনি মন্ত্রীকে বলতেন, "প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না।" মন্ত্রী সর্বদা উত্তর দিত, "কক্ষণো না, কক্ষণো না, মহারাজ। আপনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যেখানেই থাকুন না কেন, আমি সর্বদা আপনার কাছে কাছে থাকব। ভালো ভালো পরামর্শ দেব আর আপনার জন্যে দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করে দেব।" তাই শুনে রাজাও মহা খুসি।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় নদীর ধারে বেড়িয়ে রাজা প্রাসাদে ফিরছেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন পাশেই বনের মধ্যে এক পাল শেয়াল ডাকছে। রাজার বেজায় কৌতূহল হল। শেয়ালগুলো ডাকছে কেন তাঁকে জানতে হবে।

মন্ত্রীর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্ত্রী, এতগুলো শেয়াল

এক সঙ্গে ডাকছেই বা কেন? আর তাও এমন সময় ডাকছে কেন যখন আমার রাজকীয় কান তাদের চিৎকার শুনতে বাধ্য হচ্ছে?"

মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, আপনার তো জানাই আছে যে এ বছর শীতটা বড় বেশি করে পড়েছে। শেয়াল বেচারিদের তো আর গরম জামা নেই, তাই আপনার কাছে ওরা কম্বল ভিক্ষা করছে।"

রাজা বললেন, "তাইতো বটে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে-মন্ত্রী শেয়ালের মনের কথাও বুঝতে পারে সে বাস্তবিকই বুদ্ধিমান। কিন্তু শেয়ালদের কম্বল নেই কেন?" মন্ত্রীর মনে মনে দুঃস্থ-ত্রান-বিভাগের সচিবের উপরে অনেক দিনের রাগ ছিল। তাই সে বলল, "সব আমাদের ত্রাণ সচিবের দোষ।"

রাজা বললেন, "কি সাংঘাতিক! আমাদের ত্রাণ সচিব মহামূল্য শেয়ালদের কম্বল থেকে বঞ্চিত করেছে নাকি? বেশ, তাকে ধরে এনে, একটা কম্বলে জড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হক। তারপর একশো কম্বল কিনে আমার শেয়াল বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দিও।"

যেন কতই ব্যস্ত এমনি ভান করে, মন্ত্রী রাজার আজ্ঞা পালন করতে গেল। কিন্তু পালন করল শুধু আদেশের প্রথম দিকটা। সচিব বেচারি মারা পড়ল। তারপর যদিও রাজকোষ থেকে কম্বল কেনার টাকা বের করে নেওয়া হল, তবু কম্বল টম্বল কেনা হল না।

পর দিন সন্ধ্যায় রাজা আবার শুনলেন শেয়াল ডাকছে। অবাক হয়ে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার কি হল? শেয়ালগুলো আবার ডাকে কেন?

মুচকি হেসে মন্ত্রী বলল, "একেবারে অন্য কারণে, মহারাজ! ওরা চিৎকার করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।"

রাজা বললেন, "কি অপূর্ব ব্যাপার। এ কথা আমার কখনোই মনে হত না। আমার মন্ত্রীর মতো মন্ত্রী আর কোনো রাজা পাবে কোথায়! মন্ত্রীমশাই, তুমি আমার কাছে থাকলে, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারও আমার আঙ্গুলের ডগায় থাকে! কথা দাও আমাকে ছেড়ে তুমি কখনো যাবে না।

মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলল, "কখনো যাব না, মহারাজ, স্বর্গেই যান কি পাতালেই যান, আমিও সঙ্গে যাব।"

রাজা মহা খুসি। কিন্তু খুসিটা খুব বেশিক্ষণ টিকল না। হঠাৎ পাশ দিয়ে ছোট একটা বুনো শূওর দৌড়ে গেল। রাজা কখনো বনের মধ্যে শিকারে যান নি, ছোট রাজধানীটি ছেড়ে কখনো বাইরে যান নি, কাজেই কখনো বুনো শূওরও দেখেন নি। বেজায় আশ্চর্য হয়ে তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাপরে বাপ, মন্ত্রী, ওটা কি?"

মন্ত্রী ঢের বুনো শূওর দেখেছিল। কিন্তু চিরকেলে অভ্যাস মতো রাজার অজ্ঞতা থেকে সে নিজের কিঞ্চিৎ সুবিধা করে নেবার তালে ছিল। কাজেই সে বলল, "ওটা আপনার একটা হাতি, মহারাজ। যে কর্মচারি হাতির দেখাশুনো করে, সে ওকে ভালো করে খেতে দেয় নি বলেই বেচারার এমন দুর্দশা।"

রাগে রাজা কাঁপতে লাগলেন। তক্ষুণি ঐ কর্মচারির প্রাণদণ্ড দিলেন। তারপর মন্ত্রীকে বললেন, "হাতিটার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য যত টাকা দরকার সব রাজকোষ থেকে বের করে নিও।"

বলা বাহুল্য মন্ত্রী রাশি রাশি টাকা বের করে নিল বটে, কিন্তু সব নিজের ট্যাঁকে পুরল।

এক মাস কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে ফিরবার সময়, আবার সেই বুনো শূওরটা রাজার সামনে পড়ে গেল। তিনি মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই না সেই সে-দিনের দেখা উপোস করা হাতিটা? এটা কি করে সম্ভব হল যে এখনো তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নি?"

আক্কেল দাঁত পর্যন্ত বের করে মন্ত্রী হাসল। "না, মহারাজ, সে হাতিটার এখন হুজুরের মতোই গোল চেহারা। এটা একটা ইঁদুর; মহারাজের পাকশালের খাবার খেয়ে খেয়ে এমনি মোটা হয়েছে। এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে মহারাজের প্রধান পাচকের কাজে কেমন গাফিলতি!

মোটা রাজার গোল মুখ পাকা লঙ্কার মতো লাল হয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন "এ তো বড় দুঃখের কথা যে রাঁধুনের দোষে আমার স্বাস্থ্য ইঁদুরে পায়!"

তখুনি রাজা হুকুম দিলেন রাতের রান্নাবান্না শেষ হলে, রাঁধুনেকে ফাঁসি দেওয়া হক।

সন্ধ্যাবেলায় গোপনে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, পাচক-ঠাকুর তাকে অনেক টাকা-কড়ি দিল। তার উপর এও বলল যে যখনি রাজার জন্য সে একটা বিশেষ রকমের ভালো কিছু রাঁধবে, তখন মন্ত্রীকেও ভাগ পাঠাবে।

মন্ত্রীর ফূর্তি দেখে কে! পাচক-ঠাকুরকে সে আশ্বাস দিল, "আমি দেখব যাতে তোমার কোনো অনিষ্ট না হয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

মাঝরাতে, সবে রাজার সামনে রাঁধুনের ফাঁসির ব্যবস্থা হচ্ছে,

এমন সময় মন্ত্রী দৌড়ে এসে বলল, "থাম, থাম!" তারপর রাজার দিকে ফিরে সে বলল, "মহারাজ, এইমাত্র পাঁজিতে দেখলাম, এই মাঝ রাতের মুহূর্তটি বড়ই শুভ। এই সময় যার ফাঁসি হবে, তার জন্যে স্বর্গে আসন পাতা আছে। এই রাঁধুনে ব্যাটাকে ফাঁসি দেওয়া মানে শাস্তির বদলে বরং তাকে বর দেওয়া। যে পাপিষ্ঠ আপনার জায়গায় একটা ইঁদুরকে মোটা বানিয়েছে, তাকে স্বর্গে পাঠানোর কি কোনো মানে হয়?"

মন্ত্রীর নিশ্চিত ধারণা, কোনো গতিকে ফাঁসি দেওয়াটা স্থগিত করতে

পারলেই, রাজা সে বিষয়ে বেমালুম ভুলে যাবেন। তাঁর মনটা তো একটা ছাঁকনা বিশেষ।

এদিকে মন্ত্রীর কথা শুনে, রাজা আনন্দে নেচে উঠলেন। বললেন, "বাঃ, খুব ভালো, খুব ভালো! অনেক দিন থেকেই আমার স্বর্গ দেখার শখ!" তারপর জল্লাদকে বললেন, "এক্ষুণি আমার গলায় ফাঁসটা পরিয়ে পত্রপাঠ আমাকে লটকিয়ে দাও।"

তারপর সবে ঝোলানো ফাঁসটার দিকে এগুতে যাবেন, এমন সময় কি ভেবে থামলেন। মন্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "মন্ত্রীবর, এবার তোমার কথা রাখ। আমাকে তুমি কখনো ছেড়ে যাবে না বলেছ। তাহলে আমার আগে আগে তুমি স্বর্গে চল।"

জল্লাদকে রাজা হুকুম দিলেন আগে মন্ত্রীকে ফাঁসি দিতে হবে। মন্ত্রী তো ভয়ে আধ-মরা, কিন্তু কিছু বলার আর সময় পেল না। তার আগেই জল্লাদ তাকে ধরে টেনে নিয়ে এল, সভাসদরা তার মাথাটাকে ফাঁসের মধ্যে গুঁজে দিল। তাঁর আজ্ঞা পালনে তাদের তৎপরতা দেখে রাজা বেজায় খুসি।

যেই মন্ত্রীর ফাঁসি হয়ে গেল, সবাই মিলে রাজার দিকে ফিরে, যেমন তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, তাঁকেও লটকিয়ে দিল।
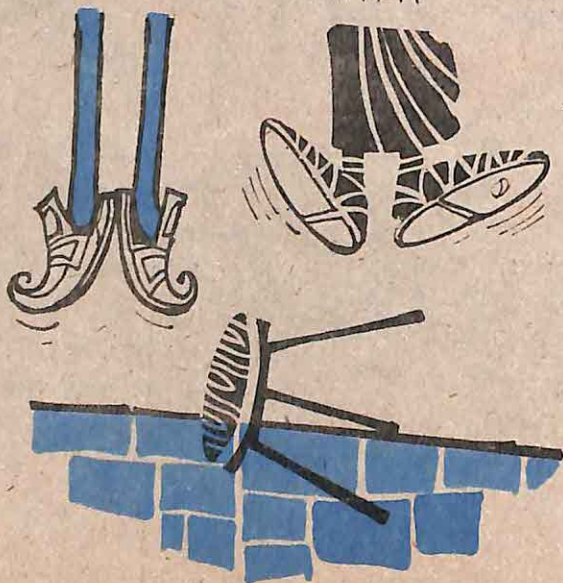
বরের মতো বর

এক অন্ধকার বর্ষার রাতে, একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে এক রাজা যাচ্ছিলেন। অভ্যাসমতো তিনি ছদ্মবেশে চলেছিলেন। প্রজারা কি ভাবে জীবন কাটায় দেখবার জন্যে, সাধারণ লোক সেজে ঘুরে বেড়ানো তাঁর বাতিক ছিল।

সেদিন রাজা বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে। অবিশ্যি তাতে তাঁর বিশেষ এসে যেত না। শীত সইবার মতো স্বাস্থ্যও ছিল। অন্ধকারেও তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। বিপদের সামনে দাঁড়াতে তাঁর এতটুকু ভয় ছিল না। কাজেই দিব্যি আয়েস করে, যদিও একটু সাবধানে, তিনি এগুতে লাগলেন।

এদিকে কিন্তু কয়েকটা ডাকাত খুব সন্তর্পণে তাঁর পিছু নিয়েছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল রাজার ঘোড়াটা বেজায় ভালো এবং তাদের মৎলব সেটি হস্তগত করে।

হঠাৎ ডাকাতরা রাজাকে ঘিরে ফেলল। রাজা মোটেই তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তবু তিনি এতটুকু ঘাবড়ালেন না। দুঃখের বিষয়, যেই না সেখান থেকে পিট্টান দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময় তাঁর ঘোড়ার একটা খুর রাস্তার একটা ফাটলে আটকিয়ে গেল। ডাকাতের দলে এক ডজনেরো বেশি লোক, তারা সবে রাজার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় ছয়জন যুবক সেখানে এসে হাজির। তারা রাজাকে সাহায্য

করতে এগিয়ে এল। পিছন থেকে তারা ডাকাতদের আক্রমণ করে বসল। এই হঠাৎ আক্রমণে ডাকাতরা এমনি হতভম্ব হয়ে গেল যে তারা রাজার কোনো অনিষ্ট করতে পারল না।

যখনি রাজা ছদ্মবেশে বেরুতেন, তাঁর সবচেয়ে দক্ষ রক্ষীদের কয়েক-জন, খানিকটা তফাতে থেকে তাঁর পিছন পিছন যেত। এবার তারা এসে উপস্থিত হল। ডাকাতদের কোন-ঠাসা করা হল। তারা পালাতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পারল না। তাদের বন্দী করে ফেলতে রক্ষীদের বেশি কষ্ট করতে হল না।

তারা যে স্বয়ং রাজার এত বড় একটা উপকার করছে, সে কথা না জেনেই যে যুবকরা তাঁকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, তাদের উপর রাজা মহা খুসি। তাদের ধন্যবাদ জানাবার পর, রাজা খুব পেড়া-পিড়ি করতে লাগলেন তারা যেন তাঁর সঙ্গে রাজ-প্রাসাদে যায়।

ঐ যুবকরা অনেক দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছিল। একই সরাইখানায় ওঠাতে তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল।

পরদিন সকাল হতেই আগের রাতের ঘটনাগুলো চারদিকে জানাজানি হয়ে গেল। ডাকাতরা তাদের রাজার কোনো অনিষ্ট করতে পারে নি বলে প্রজারা খুব খুসি। রাজ-পরিবারের সবাই, মন্ত্রীরা, সভাসদ্‌রা, আর জনসাধারণ যুবকদের অসাধারণ সাহসের ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন।

তারপর রাজা দরবারে বসলে পর, ঐ ছয়জন যুবককে তাঁর সামনে আনা হল। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাদের আলিঙ্গন করলেন। তারা তাঁর যে উপকার করেছে তার জন্য তিনি তাদের পুরস্কার দিতে চাইলেন।

রাজা ঘোষণা করলেন, "যে জিনিস পেলে সে সবচেয়ে খুসি হয়, প্রত্যেকে এসে আমার কাছে তাই চাক। আমি তখনি তার ইচ্ছা পূর্ণ করব, যদি না সেটা আমার ক্ষমতা বা সাধ্যের বাইরে হয়।"

সবার আগে ছয় বন্ধুর মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কি চায়। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, "মহারাজ, একটা ভালো বাড়িতে থাকার আমার অনেক দিনের শখ। আমার এই শখটা কি

মেটাতে পারবেন?" তৎক্ষণাৎ রাজা তাঁর নিজের স্থপতিকে ডেকে পাঠিয়ে, হুকুম দিলেন যেন সে ঐ যুবকের জন্য চমৎকার একটা বাড়ি বানিয়ে দেয়।

তারপরে যার পালা সে বলল সে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হতে চায়।
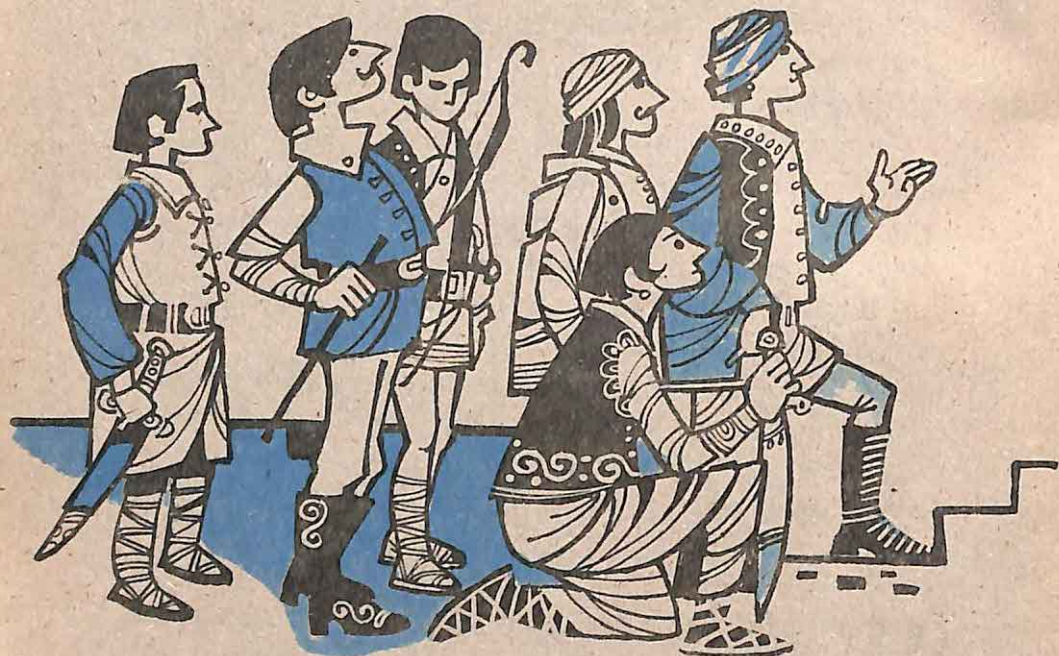
রাজা তাকে কয়েকটা উপাধি খেতাব দিয়ে, তাঁর রাজ-পরিষদের সভ্য করে নিলেন।

তৃতীয় যুবক বলল, "প্রভু, প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের গাঁয়ের লোকরা তাদের খেতের শাক-সবজি বিক্রি করতে শহরে আসে। কিন্তু গাঁ থেকে শহরে আসবার একটাও ভালো রাস্তা নেই, তাই তাদের বড় কষ্ট পেতে হয়, বিশেষ করে বর্ষাকালে। আমার এই প্রার্থনা, গরীব গ্রামবাসীদের জন্য একটা ভালো রাস্তা করে দেওয়া হক।"

রাজা ইসারায় তাঁর অনুমোদন জানালেন। পথ তৈরি, সাঁকো বানানোর কাজ যে-মন্ত্রীর হাতে ছিল, তিনিও একটা স্মারক-লিপি লিখে নিলেন।

তারপর যখন চতুর্থ যুবককে তার ইচ্ছা বলতে বলা হল, সে মুখ লাল করে বলল, "মহারাজ, আপনি আমার পিতার সমান। আমার জন্যে একটি সুন্দরী-বৌ খুঁজে দিন।" রাজার বিদূষকের একটি সুন্দর মেয়ে ছিল। রাজা বিদূষককে বললেন ঐ যুবকের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে। বিদূষকও আনন্দের সঙ্গে রাজি হল।

পঞ্চম যুবক টাকা চাইল। তখনি তাকে থলি থলি মোহর দেওয়া হল।

অবশেষে ষষ্ঠ যুবকের পালা এল। সে বলল, "মহারাজ, আমার ইচ্ছা যতদিন না আমাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়, বছরে একবার আপনি এসে আমার অতিথি হবেন।"

যুবকের এমন অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে সবাই অবাক হন। অনেকে ভাবল লোকটা একটা আহাম্মুক। এমন কি, রাজার নিজেরও প্রার্থনা-টাকে একটু বেয়াড়া মনে হল। কিন্তু তিনি তো আগেই কথা দিয়েছিলেন যে নিতান্ত অসাধ্য না হলে, তিনি যার যা ইচ্ছা পালন করবেন। কাজেই তিনি প্রত্যেক বছর যুবকের বাড়িতে একটা দিন আর একটা রাত কাটাতে রাজি হলেন।

রাজ সরকারের নানান বিভাগের উপর ভার দেওয়া হল যাতে যুবকের বাড়িতে রাজার বার্ষিক যাত্রার উপযুক্ত আয়োজন করা হয়।

প্রথমেই একটা ভালো রাজপথ তৈরি করতে হল, যাতে রাজার রথ রাজবাড়ি থেকে যুবকের গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত আরামে যেতে পারে। তারপর প্রশ্ন উঠল, একটা গরীব মানুষের কুঁড়ে ঘরে কি করে রাজা বেশ কিছুদিন এবং রাত কাটাবেন? কাজেই যুবকের জন্য রাজার যোগ্য একটা জমকালো প্রাসাদ তৈরি করা হল। কিন্তু যুবকের যে সামান্য আয়, তাই দিয়ে সে রাজবাড়ির যত্নই বা করবে কি করে আর রাজার আর তাঁর পরিষদ-বর্গের উপযুক্ত আপ্যায়নই বা করবে কোথা থেকে? এই সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েক থলি মোহর আর প্রচুর মাসোয়ারার ব্যবস্থা হল।

এখন পুরাকাল থেকে এই নিয়মই হয়ে আসছে যে উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি ছাড়া রাজারা কারো আতিথ্য গ্রহণ করেন না। কাজেই যুবককে বিশেষ উপাধি খেতাব দিয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করা হল। রাজ-বংশের ছেলেদের সমান তাকে সম্মান দেওয়া হল।

এসব ছাড়াও আরেকটা বিষয়ও চিন্তা করা দরকার হয়ে পড়ল। যে বাড়িতে রাজা আতিথ্য গ্রহণ করবেন, সেখানকার গৃহিণীর রাজার রুচি আর সূক্ষ্ম পছন্দ ইত্যাদি জানা দরকার। রাজার মেয়ের চেয়ে এসব বিষয়ে কে বেশি জানে? কাজেই, অল্পদিনের মধ্যেই রাজকন্যার সঙ্গে যুবকের বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

অতএব দেখা গেল একটি মাত্র বর চেয়ে এই যুবক তার পাঁচ বন্ধু মিলে যা পেয়েছিল, সে সবই পেল, উপরন্তু আরো অনেক বেশিই পেল।

মুখে মুখে দেয়া-নেয়া

একদিন সন্ধ্যাবেলায় একজন বুড়ো মানুষ একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা বাড়ির ভিতর থেকে ভারি মিষ্টি সুরেলা গলার গান শুনতে পেলেন। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি গানটার শেষ অবধি শুনলেন। তারপর বাড়ির কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখলেন যে গাইয়েটি হল একটি ছোট মেয়ে। তিনি স্নেহভরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তাকে একটা সোনার মোহর দিলেন।

মেয়ের বাপ, মোহন, কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এমন অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে সে তো মহা খুসি। অমনি সে মেয়ের হাত থেকে মোহর-টাকে ছিনিয়ে নিল। বুড়ো মানুষটি চলে যাবেন বলে ফিরে দাঁড়ালেন। মোহন চিৎকার করে বলল, "দাঁড়াও, আমার বাকি পাওনাটার কি হল ?"

বুড়ো অবাক হয়ে মোহনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোহন বলে যেতে লাগল, "দেখ, বুড়ো, আমার মেয়ের গান উপভোগ করার দাম মোটেই একটা মোহর নয়, দশটা মোহর। বাকিটা যত শীগগির দিয়ে ফেলবে, ততই ভালো।"

মোহন যে মহা পাজি সেটা বুঝতে বুড়ো মানুষটির বেশি সময় লাগল না। তবু তিনি ভালোমানুষ সেজে বললেন, "ওহে, খুদে গাইয়ের মস্ত বাপ, বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হল যে আপাততঃ আমার কাছে আর মোহর-টোহর নেই। এখন কি করা যায়?"

মোহন উত্তর দিল, "তোমার মাথার টুপি, সোনার হার, জুতোজোড়া দিয়ে যেতে পার।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার মাথাটি যখন এত বুদ্ধি দিয়ে ঠাসা, ও একটা টুপি পাওয়ার যোগ্য বৈ-কি। আর তোমার গলাটি যখন এমন উৎকৃষ্ট একটা মাথাকে ধারণ করে রেখেছে, সেও একটা হারের যোগ্য। কিন্তু ভাই, এসব বড্ড পুরনো, এগুলোর কি-ই বা দাম! তার চেয়ে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল না কেন? আমি খুসি হয়ে তোমাকে একশোটা তাজা তাজা মোহর দেব। আমার কাছে যেটা ছিল তার-তো সব জেল্লা চলে গেছে। আমার সঙ্গে আসতে যদি রাজি থাক, সেটা বরং আমাকে ফিরিয়ে দিতে পার।"

মোহনের ফূর্তি দেখে কে? "একশোটা সোনার মোহর! তুমি তো বড় ভালো লোক দেখছি। তোমার বাড়ি কত দূরে? অবিশ্যি একশোটা সোনার মোহরের জন্য আমি এক হাজার মাইল হাঁটতে রাজি আছি।"

বুড়ো মানুষটি বললেন, "অত হাঁটার দরকার হবে না। মাত্র তিন মাইল গেলেই চলবে।"

মোহন তখন আগের মোহরটা ফিরিয়ে দিল। তারপর সেই একশোটা মোহরের আশায় অচেনা মানুষটির পিছন পিছন চলল।

চলতে চলতে মোহন ভারি স্ফূর্তি প্রকাশ করতে লাগল, মনে হল আনন্দের চোটে বুঝি সে ফেটেই যাবে। বুড়োকে সে জিজ্ঞাসা করল, "একশোটা সোনার মোহর দিয়ে কি করব জান?

বুড়ো বললেন, "না, জানি না তো।" "এমন একটা প্রাসাদ তৈরি করব, যা রাজার বাড়িকেও হার মানাবে।" "ও, তাই বুঝি!"

"তারপর রাজাকে বলব আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে।"

"কিন্তু তোমার তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, একটা মেয়েও আছে!"

"তাতে কি? আবার বিয়ে করব, আর এবার রাজকন্যার চেয়ে কম দিয়ে চলবে না।"

"ওহো, তাই বুঝি!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরে পৌঁছে, তারা রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল। বুড়োকে রাজবাড়ির সিংহ দরজার দিকে এগুতে দেখে, মোহন বলল, "ওকি, ওদিকে যাচ্ছ কেন?"

বুড়ো বললেন, "এটাই তো আমার বাড়ি।"

তখন মোহন বুড়োর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ তাঁকে চিনতে পারল। ইনিই তো রাজা। এর আগে সে তাঁকে চিনতে পারে নি, কারণ তিনি ছিলেন ছদ্মবেশে।

মোহনের মুখে কথা সরে না। তখন রাজা নম্রভাবে বললেন, "তাহলে খুদে গাইয়ের মস্ত বাপ, এবার তুমি যেতে পার। তোমার মেয়ের গান শুনে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য আনন্দ পেয়েছিলাম। তার বদলে, একশো মোহর দেব বলে পুরো এক ঘণ্টা ধরে তোমাকে আনন্দ দিই নি কি? তোমার মেয়ের মুখের গানে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। তেমনি আমার মুখের আশ্বাস শুনে তুমি আনন্দ পেয়েছ; সমান সমান হয়ে গেল। আরো বলতে হয়, তোমার লোভ দেখে আমার আনন্দ হতাশায় পরিণত হয়েছিল। কাজেই ব্যাপারটাকে আরো ন্যায্যভাবে শেষ করবার জন্য, যাতে তোমার স্ফূর্তিও হতাশায় পরিণত হয়, তার ব্যবস্থা করতে হল। এবার ভাগো হিঁয়াসে।"

হায়, হায়, যদিবা একটা মোহর পাওয়া গেছিল, তাও হাতছাড়া হয়ে গেল! এই বলে হা-হুতাশ করতে করতে মোহন তখন নিজের গ্রামে ফিরে গেল।

সবার সেরা পাত্র

সরযূ নদীর তীরে এক ভিক্ষুক ও তার স্ত্রী থাকত। তারা ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করত, সামান্য কাপড়-চোপড় পরত আর চারদিকের গ্রামের লোকরা যখন যা দিত, তাই খেত।

তাদের ছেলেপিলে ছিল না। ভিক্ষুকের স্ত্রীর বড় ইচ্ছা তারা একটি

ছেলে কি মেয়ে পুষ্যি নেয়। ভিক্ষুক কাছাকাছি সব গ্রামের বাড়িতে ঘুরে এল। কিন্তু এমন গরীবকে কেউ ছেলেমেয়ে পুষ্যি দিতে রাজি হল না।

ভিক্ষুক গরীব হলেও, তার নানারকম দৈব শক্তি ছিল। একদিন সে তার কুঁড়ে ঘরের সামনে বসে আছে, এমন সময় মাথার উপর দিয়ে একটা কাক উড়ে যাচ্ছিল আর টুপ করে তার ঠোঁট থেকে একটা নেংটি ইঁদুর পড়ে গেল। ভিক্ষুকের স্ত্রী সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে, সুস্থ করে তুলল। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বলল, "কেউ যখন আমাদের ছেলে কি মেয়ে দেবে না, তুমি কেন দৈব বলে এই ইঁদুরটাকে একটা ছোট শিশু বানিয়ে দাও না!"

ভিক্ষুক হেসে সম্মত হল। বলল, "বেশ, তুমি যাতে খুসি হও, আমি তাই করছি।"

তারপর ভিক্ষুক কয়েকটা মন্ত্র পড়ে, কমণ্ডলু থেকে একটু জল ইঁদুরের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই, ইঁদুরটা একটি সুন্দর ছোট্ট খুকী হয়ে গেল।

ভিক্ষুকের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। সে মেয়েটিকে খুব আদর যত্ন করত আর যেখানে যা খাবার জোগাড় করতে পারত, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালোটুকু তাকেই দিত। আদর করে তারা খুকীর নাম রাখল ইঁদুরবালা।

দিন কেটে যেতে লাগল, ইঁদুরবালা ক্রমে বড় হয়ে উঠল। ভিক্ষুক আর তার স্ত্রী তাদের সাধ্যমতো তাকে সুখী করতে আর ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করত। মেয়েটি সাহিত্য, অঙ্ক, নাচ, গান সব শিখল। তারপর তার বিয়ের বয়স হলে ভিক্ষুক একজন যোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগল। স্ত্রী বলল, "তোমার এত ক্ষমতা যে একটা নেংটি ইঁদুরকে অমন সুন্দর মেয়ে বানিয়ে দিলে। এবার তার জন্য সবার সেরা পাত্র খুঁজে এনে ক্ষমতার আরেকটু পরিচয় দাও!"

ভিক্ষুক বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আরে, আমি অনুরোধ করলে স্বয়ং সূর্য আমাদের মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবেন।"

শুনে স্ত্রী মহা খুসি। "তাই নাকি? তোমার এত ক্ষমতা! তাহলে তো সূর্যকেই জামাই করতে আমার সাধ যায়। এবার নিজের কথার প্রমাণ দাও!"

ভিক্ষুক বলল, "বেশ, দিচ্ছি।" এই বলে চোখ বুজে সে ধ্যানে বসল। হঠাৎ সূর্য তাদের সামনে দেখা দিলেন। ভিক্ষুক তাঁকে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে অনুরোধ করল।

সূর্য বললেন, "আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমরা ঠিক জান যে মেয়ের আমাকে পছন্দ হবে?"

ভিক্ষুক তখন মেয়েকে ডেকে তার সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করল। সে বলল, "বাবা, তোমার পছন্দ করা পাত্র খুবই ভালো। কিন্তু ওঁর বড় বেশি তেজ। আরো ভালো আরো মহান্ কাউকে পাওয়া যায় না?"

সূর্যর চেয়েও আরো ভালো আরো মহান পাত্র কে হতে পারে, ভিক্ষুক ভেবে পেল না। তাকে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখে শেষে সূর্যই বললেন,

"আমার মতে মেঘ আমার চেয়েও ভালো আর শক্তিশালী, কারণ অনেক সময়ই সে কি আমার তেজ কমিয়ে দেয় না? এমন কি পৃথিবীর লোকদের কাছ থেকে আমাকে আড়াল করে দেয় পর্যন্ত!"

এই বলে সূর্য বিদায় নিলেন। একটু পরেই মেঘ এসে ভিক্ষুকের কুটিরের সামনে দেখা দিলেন। এবার মেঘকে তার মেয়ে বিয়ে করার কথা না বলে, ভিক্ষুক মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করল মেঘ তার স্বামী হলে কেমন হয়।

মেয়েটি এক মুহূর্ত মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, এ পাত্রও ভালো, কিন্তু রঙটা বেশ কালো নয় কি? এঁর চেয়েও ভালো, এঁর চেয়েও শক্তিমান কাউকে পাওয়া যায় না?"

ভিক্ষুক জিজ্ঞাসুভাবে মেঘের দিকে চাইতেই, মেঘ বললেন, "বায়ুকে আমার চেয়েও ভালো আর শক্তিশালী বলা যেতে পারে, কারণ সে তো অনেক সময়ই আমাকে আকাশের এক কোনা থেকে ঠেলে আরেক কোনায় নিয়ে যায়।"

মেঘ বিদায় নিলেন। তার পরের মুহূর্তেই বায়ু দেখা দিলেন। ইঁদুরবালা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, এঁকে দেখে মনে হয় এঁর মন কখনো স্থির থাকে না। আরো ভালো, আরো শক্তিমান কেউ নেই নাকি?"

ভিক্ষুক উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তখন বায়ু বললেন, "চিন্তা কর না। পাহাড় যে আমার চেয়েও ভালো আর শক্তিশালী,

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ-ই নেই। কারণ আমার এমন প্রচণ্ড বল থাকা সত্ত্বেও, তাকে এতটুকু নড়াতে পারি না। তাকে দেখলে তোমার মেয়ের নিশ্চয় পছন্দ হবে।"

বায়ু চলে যেতেই, পাহাড় দেখা দিল। নবাগতর দিকে তাকিয়ে দেখে ইঁদুরবালা বলল, "বাবা এ পাত্র বড় আনাড়ি। আরো ভালো, অরো শক্তিমান কাউকে পাওয়া যায় না ?"

পাহাড় তখনই বলল, "যায় বৈ কি। ইঁদুরই তো আছে। একমাত্র সে-ই আমার গায়ে ছ্যাঁদা করতে সাহস পায়। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ের সঙ্গে তাকে মানাবে ভালো।"

পাহাড় অদৃশ্য হতেই, ইঁদুরের আবির্ভাব হল। তাকে দেখামাত্র ইঁদুর-বালা মহা আনন্দে বলে উঠল, "ও বাবা, এই সাহসী যুবকের মতো আর কে আছে! সবার চেয়ে মহান পাত্র তোমার হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও, এতক্ষণ কেন আমাকে সূর্য আর বায়ু দেখাচ্ছিলে ? যে যাই হক, বাবা, চমৎকার পাত্রের সঙ্গে যত শিগগীর সম্ভব আমার বিবাহের মত দাও।"

ইঁদুরবালার ইঁদুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। সে পালক মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্বামীর কাছে চলে গেল।

ভিক্ষুকের স্ত্রী বলল, "এ তো বড়ই দুঃখের কথা। আমি-ও ওর জন্য সব চেয়ে ভালো পাত্রই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ও যাকে সব চেয়ে ভালো মনে করেছে, তাকেই বেছে নিয়েছে।"

রাজার ছেলের কপাল ফেরা

মস্ত এক জঙ্গলের মাঝখানে কুমার বলে একজন অল্প-বয়সী ছেলে আর তার মা থাকত। চারদিকে অনেক দূর অবধি আর কোনো বাড়ি-ঘর দেখা যেত না। বাইরে তাকালেই কুমার দেখত শুধু গাছ আর গাছ, শাল, সুঁদুরি শিমুল, মহুয়া। শব্দের মধ্যে শুনত শুধু ছোট নদীর মৃদু কল্লোল, জন্তু-জানোয়ারের ডাক আর পাখির কাকলী।

কুমারের যখন কাজ করবার মতো বয়স হল, সে রোজ সন্ধ্যায় নানান্ জায়গায় ফাঁদ পেতে রাখত। সকালে দেখত একটা ফাঁদে একটা কস্তুরী হরিণ ধরা পড়েছে। দু তিন দিন অন্তর দূর থেকে একজন ব্যবসাদার আসত। সে হরিণটাকে নিয়ে যেত আর তার বদলে ওদের জন্য কাপড়-চোপড় খাবার-দাবার রেখে যেত। কুমার পড়বে বলে তাল পাতার পুঁথিও সে আনত।

মাঝে মাঝে দূরের সব গ্রাম থেকে কুমারের সম-বয়সী ছেলেরা আসত

বন থেকে ফল, মূল, ময়ূরের পালক কুড়োতে। তারা কুমারকে বড় ভালোবাসত। একদিন তারা তাকে বলল, "আমাদের রোজ রোজ তোমার সঙ্গে খেলতে, গান গাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন খুসি তখন তো আমরা বনে আসতে পারি না। বড্ড দূরে কিনা, তাছাড়া পথে নানান্ বিপদ। তার চেয়ে তুমি কেন এসে আমাদের সঙ্গে থাক না? এই রকম নির্জনে থাকার মানে কি?"

বন্ধুরা চলে গেলে, কুমার এক দৌড়ে তার মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মা, আমাদের কেন এই অন্ধকার বনের মধ্যে থাকতে হয়? আমার সব বন্ধুরা কেমন কাছাকাছি থাকে। আমরাই বা গিয়ে তাদের মধ্যে থাকি না কেন?"

মা প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না। কুমার আবার জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "আমাদের চিরকাল এই বনেই থাকতে হবে। অন্য লোকের কাছাকাছি গিয়ে বাস করা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।"

কুমার অনুনয় করতে লাগল, "আরেকটু বল না, মা।" মা বললেন, "না, বাবা, আর বেশি শুনলে তোমার মনে কষ্ট হতে পারে।"

কুমার জোর গলায় বলল, "কক্ষনো না। আমি কথা দিচ্ছি, যত দুঃখের কাহিনীই তুমি বল না কেন, আমি হাসি মুখেই শুনব।"

মা আবার চুপ করে রইলেন। কিন্তু তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন কুমার নরম-গলায় বলল, "মাগো, তোমার যদি বলতে কষ্ট হয়, তা হলে থাক, নাই বা বললে।"

মা উত্তর দিলেন, "না, বাবা, বোধ হয় তোমাকে সব কথা বলার সময় হয়েছে। যদি সমস্ত বোঝ, তা হলে হয়তো তুমি আরো সাবধান হবে।"

এই বলে, মা তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

"তোমার যখন এক বছর বয়স, তখন থেকেই আমরা বনে বাস করি। কাজেই, আগে কোথায় ছিলাম সে-কথা তোমার মনে না থাকাই স্বাভাবিক। শুনে নিশ্চয় আশ্চর্য হবে যে আমরা একটা প্রকাণ্ড রাজবাড়িতে থাকতাম।

তোমার বাবাই ছিলেন এ-দেশের রাজা। তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান।

তাঁর পরে তোমার-ই রাজ্য পাবার কথা। কিন্তু আমাদের ভাগ্য বিরূপ।

যে-দিন তুমি জন্মেছিলে, সেদিন রাজবাড়ীতে সে কি আনন্দ উৎসব। আমি বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝ-রাতে ঘুম ভাঙ্গল। ধাইমারা, সখীরা সবাই তখন ঘুমে অচেতন। আমি আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। অবাক হয়ে দেখলাম এক জ্যোতির্ময় মূর্তি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি শুনেছিলাম কোনো ছোট ছেলে জন্মাবার একটু পরেই, ভাগ্য-দেবতা এসে তার জীবনে কি ঘটবে না ঘটবে সব কথা তার কপালে লিখে দিয়ে যান। সাধারণতঃ তিনি অদৃশ্যভাবে আসেন যান। কিন্তু এক আধ বার তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

তখনি বুঝতে পারলাম ঐ জ্যোতিময় মূর্তি ভাগ্য-দেবতা ছাড়া আর কেউ নয়। আমি উঠে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে জানতে চাইলাম

তোমার কপালে কি লিখেছেন। তিনি কোনো কথাই বলতে চাইলেন না। আমিও কিছুতেই ছাড়লাম না। তাঁকে বললাম তোমার ভাগ্যে কি আছে, আমাকে না বললে, তাঁকে কিছুতেই যেতে দেব না। তখন তিনি বলতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তার সর্বনেশে কথাগুলো আমার মাথায় দশমন বোঝার মতো চেপে বসল। তিনি বললেন তোমার ভাগ্যে আছে সারা জীবন গরীবের মতো থাকা।

এর অল্প দিন পরেই তোমার বাবা দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। প্রধান মন্ত্রীর উপর তোমার বাবার বড় বিশ্বাস ছিল, তাই এখন তাঁর জেজায়

দাপট। তিনি আমাদের দুজনকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। ভাগ্যিস তাঁর মৎলবের কথা আমার কানে এল। আমার কাছে তোমার জীবনের দাম রাজ্যের চেয়েও অনেক বেশি। কাজেই একদিন রাতের বেলায় তোমাকে নিয়ে এই বনে পালিয়ে এলাম। দুষ্টু প্রধান মন্ত্রী-ই এখন রাজত্ব করছেন। তিনি জানেন না যে আমরা এখানে থাকি। টের পেলে, হয়তো আমাদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করবেন। এই জন্যেই আমি এখান থেকে কোথাও যেতে চাইনা।

ভাগ্য-দেবতা এই বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গরীব হলেও, তোমাকে কখনো অনাহারে থাকতে হবে না। এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে রোজ রাতে একটা করে কস্তুরী হরিণ নিশ্চয়ই তোমার ফাঁদে পড়বে। অনেক বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায়, আমি নিজে গিয়ে ফাঁদ পেতেছি। গত দুই বছর ধরে তুমি সেই কাজের ভার নিয়েছ। যদিও সে-কথা ভাবলেও দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, তবু আমার মনে হয় এই ভাবেই তোমার জীবনটা কাটবে।"

কুমার গভীর মনোযোগ দিয়ে মায়ের সব কথা শুনল। তারপর একটুক্ষণ চিন্তা করে, শেষে মাকে বলল, "মাগো এই ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছে, যে-তুমি একদিন রানী ছিলে আর এখন যার রাজ-মাতার সম্মান পাওয়া উচিত, তাকে কি না এইভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে! আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি তো অন্য কোনো রকম জীবনের কথা জানিও না। বনে বাস করাতে আমার কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু এখন তো নিজের জন্মের কথা, প্রধান মন্ত্রীর দুষ্টুমির কথা, সব-ই জানলাম, এখন আর চুপ করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে দুর্বৃত্ত অন্যায় ভাবে আমার বাবার রাজ্য দখল করে আছে, তার হাত থেকে সেই রাজ্য উদ্ধার করবার জন্য যা-হয় একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।"

মা বললেন, "বাবা, রাগ করে লাভ নেই। এই তোমার ভাগ্য।"

কুমার বলল, "তা হলে ভাগ্যটাকে ফেরাতে হবে।"

তার গলার স্বরে এমন দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পেল যে তার মায়ের মনে হল এখন চুপ করে থাকাই ভালো।

অনেকক্ষণ ধরে কুমার গভীর চিন্তায় ডুবে, চুপ করে বসে রইল।

তারপর হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আচ্ছা, মা, তুমি না বলেছিলে ভাগ্য-দেবতা আমার কপালে লিখেছেন যে রোজ রাতে একটা করে কস্তুরী হরিণ আমার ফাঁদে পড়বে?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, তাই।"

কুমার তখন বলল, "বেশ, এই সূত্র থেকেই ভাগ্যের সঙ্গে আমার লড়াই শুরু হবে।"

সেদিন সন্ধ্যায় অন্য দিনের মতো নানান্ জায়গায় দশটা জাল না পেতে, কুমার মাত্র পাঁচটা পাতল। তবু একটা জালে হরিণ পড়ল। তারপর দিন কুমার শুধু একটি জাল পাতল। তবু দেখা গেল তাতেই একটা হরিণ পড়েছে।

তারপর দিন ফাঁদ পাতার জায়গায় জাল না পেতে, কুমার তাদের কুটিরের ছাদে একটি মাত্র জাল পেতে রাখল। পরদিন সকালে দেখা গেল তাতে একটা হরিণ পড়েছে।

পরদিন সন্ধ্যায় শিমুল গাছের মগ ডালে কুমার জাল পাতল। পরদিন দেখল তবু একটা হরিণ ধরা পড়েছে।

তারপর দিন কুমার আবার শিমুল গাছের মগ ডালে জাল পাতল, কিন্তু এবার গাছের চারদিকে আগুন জ্বেলে রাখল।

গভীর রাতে হঠাৎ কুমারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার খাটিয়ার কাছে কে যেন হাঁপাচ্ছে। দেখল পাশেই একজন অচেনা কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তার গা থেকে আলো বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে ওখানে পোড়া। এই সেই ভাগ্য দেবতা।
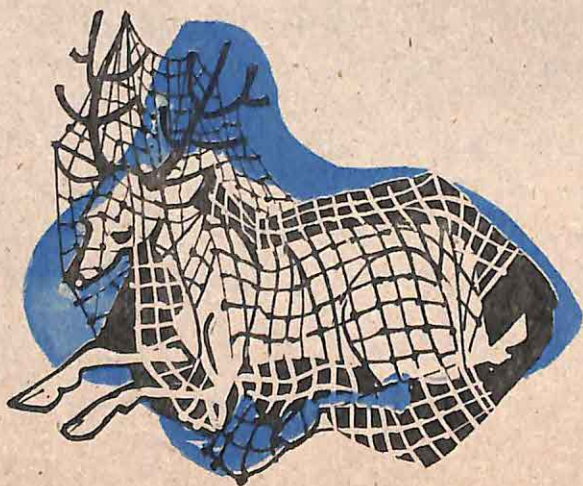
তিনি রেগেমেগে বললেন, "গাছের ডালে জাল ঝুলিয়ে চারদিকে আগুন জ্বালার মানেটা কি? কি মৎলব পাকাচ্ছ শুনি?"

কুমার বলল, "কিছু মৎলব-টৎলব পাকাচ্ছি না। আমি শুধু আমার বাবার প্রধান মন্ত্রীর মৎলবটা ফাঁসিয়ে দিতে চাইছি। আমার রাজ্য ফেরত চাই।"

ভাগ্য দেবতা আপত্তি করে বললেন, "আহা, তোমার কপালে যে লেখা আছে গরীব হয়ে জীবন কাটাবে!"

কুমার বলল, "রোজ আমার জালে হরিণ ধরা পড়বে, এ-ও আমার কপালে লেখা আছে। আমার যেখানে খুসি জাল পাতব। আপনি তাই নিয়ে নালিশ করবার কে?"

ভাগ্য-দেবতা গজ-গজ করতে লাগলেন, "আরে, এ-ও বুঝতে পারছ না যে রোজ তোমার জালে হরিণ পড়বে এ-কথা তোমার কপালে লেখা আছে বলে, রোজ আমাকে হরিণ কাঁধে নিয়ে গাছের মগ-ডালে চড়ে জালের মধ্যে তাকে ফেলতে হচ্ছে! কতদিন এ-ভাবে চলতে পারে?"

যেন তার কিছুই এসে-যাচ্ছে না এমন ভাবে কুমার বলল, "কাল বনের সবচেয়ে উঁচু গাছের মাথায় জাল ঝুলোব। তারপর ঐ গাছটার চারদিকেও আগুন জ্বালব। শুধু তাই নয়, তার উপর গাছের গায়ে সরষের তেল মাখিয়ে রাখব।"

ভাগ্য-দেবতা হতাশায় কোঁকিয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, "তোমার তো বেজায় বুদ্ধি। এতই যখন মন ঠিক করে ফেলেছ, তখন দেখছি তোমার ভাগ্যটা নতুন করে লিখতে হবে।"

সেই রাতেই ভাগ্য-দেবতা কুমারের কপালের লিখন মুছে ফেললেন। তারপর তার জায়গায় ওর জীবনে কি হবে না হবে, সব নতুন করে লিখলেন।

কয়েকদিন পরেই দেশে বিদ্রোহ হল। প্রধান মন্ত্রী মারা পড়লেন। কুমার রাজবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। তার বুড়ি ধাইমা তাকে চিনতে পারল। তারপর সবাই যখন তার ফিরে আসার কথা শুনল, তারা এক বাক্যে কুমারকেই রাজা করে দিল।
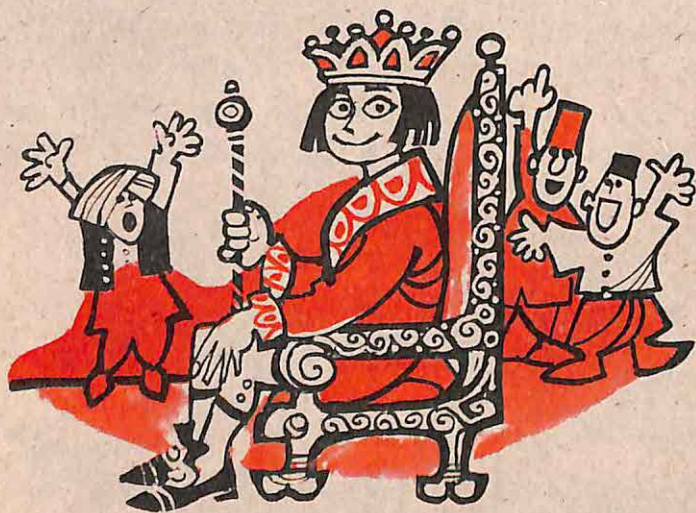
দুই মেয়ে, এক পদ্ম

এক জায়গায় তিন শো ফুট উঁচু একটা টিলার মাথায় অদ্ভুত একটা পুরনো মন্দির ছিল। এক কুঁজো বুড়ো সেখানে পূজো করতেন। মন্দিরের মাঝখানে বেদীর উপরে অধিষ্ঠিত সুন্দর একটি মূর্তি ছিল। উষা আর ললিতা দুই বন্ধু। ঐ মন্দিরের স্নেহশীল বুড়ো পূজারীর সঙ্গে গল্প করতে আর তিনি কেমন নানা রঙের ফুল দিয়ে মূর্তিটাকে সাজাতেন, তাই দেখতে তারা বড় ভালোবাসত।

প্রায়ই সকাল বেলায় উষা আর ললিতা টিলার উপরে চড়ত। তারা রডোডেণ্ড্রন ফুলের ঝোপের মধ্যে নাচত, লাফাত, গান গাইত, লুকোচুরি খেলত। ঘুঘুর ছানার ঘুম ভেঙ্গে যেত, ঘুম জড়ানো স্বরে সে বলত, "ঘু-ঘু এই দানো—ঘুঘুগুলো কি চেঁচামেচিই না করে!" একটা কাঠ-বেড়ালী সাঁ করে ছুটে ওদের পার হয়ে যেত। লোম-ওয়ালা ল্যাজ নেড়ে সে কট-কট করে বলত, "আস্পর্ধা তো কম নয়! বলে আমাকে এরা লুকোচুরি শেখাবে!" ঝকঝকে হলদে রঙের বেনে-বৌ পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে স্বর করে বলত, "আজ কালকার মেয়েরা কি বোকা গো! ওদের গায়ের জামার রঙটি ঠিক আমার বুকের মতো! আমাকে ওরা ঠাট্টা করছে নাকি!"

কিন্তু নানান্ রঙের ফুলগুলো, গোলাপী নীল হলুদ বেগুনী সব ফুল, পথের দুই পাশে বাতাসে দুলত আর ফিসফিস করে বলত, "ও ললিতা, ও উষা, এই দেখ আমরা কেমন ফুটে গেছি। এবার আমাদের তুলে নাও। তা হলে ঐ মন্দিরের সুন্দর মূর্তিকে আমাদের দিয়ে সাজাতে পারবে!"

মনের আনন্দে উষা ললিতা ফুল তুলত। তাতে প্রজাপতিরা অবিশ্যি চটে যেত। তারপর ফুলগুলি তারা পূজারীকে দিত। বুড়ো চোখে ভালো দেখতেন না, কিন্তু ফুলের গায়ে হাত বুলিয়ে ঠিক ঠিক তাদের নাম বলে দিতেন।

তারপর ফুল দিয়ে মূর্তি সাজাতেন আর মেয়ে দুটির সঙ্গে গল্প করতেন। "আরে, যুঁইফুল এনেছ যে। খুব ভালো। ভগবান তোমাদের নিষ্পাপ রাখবেন।" কখনো বলতেন, "আজ কি এনেছ, গোলাপ বুঝি? ভগবান তোমাদের প্রেম দেবেন, শান্তি দেবেন।"

একদিন সন্ধ্যা বেলায় ঊষা জিজ্ঞাসা করল, "যদি পদ্মফুল দিই, তা হলে কি হবে?"

পূজারী বললেন "পদ্ম? সে তো ফুলের রাণী। পদ্ম হল ভগবানের চেতনার ফুল। ভক্তি ভরে তাঁকে যদি পদ্ম দাও, তা হলে তাঁর খুব কাছে যেতে পারবে। আরো ভালো মেয়ে হয়ে যাবে তুমি।"

শুনে ঊষা মহা খুসি। ফুর্তির চোটে চারিদিকে সে নেচে বেড়াতে লাগল। ললিতার খটকা লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কোথায় পাবে পদ্ম?"

ঊষার মুখে রহস্যের হাসি। সে কোনো উত্তর দিল না। অনেক পেড়াপিড়ির পর সে অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, "পাহাড়ের পিছনে সেই পুরনো পুকুরটার কথা মনে আছে? সেখানে একটা পদ্মের কুঁড়ি দেখেছিলাম। আজ রাতে ফোটা উচিত। কাল ভোরে ওটিকে তুলে নিয়ে আসব।"

ললিতা খনখনে গলায় আপত্তি জানাতে লাগল, "ও পুকুরটাতো আমার বাবার!"

এ কথা ঊষার আগে মনে হয়নি। তবু তার মত বদলাল না। সে বলল, "তা হতে পারে, কিন্তু ওখানে কেউ যায় না। ফুলটা আপনি ঝরে যেত, কেউ দেখত-ও না। আমার চোখে পড়েছে। কাজেই ওটা তুলবার আমার অধিকার আছে।"

"কি করে তুলবে? পুকুর তো আমার বাবার।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"তাতে এই হয়েছে যে আমি ছাড়া কেউ ও ফুল তুলতে পাবে না।"

সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু যখন বিদায় নিল, কারো মুখে হাসি নেই। পরদিন সবে ভোর হচ্ছে, এমন সময় উষা পুকুরের কাছে চলল। সারাটা পথ সে দৌড়ে গেল। এ দিকে আকাশ ফিকে ছাই রঙ থেকে ক্রমে কোমল কমলা রঙ ধরল।

পুকুরটাকে যেই দেখতে পেল, উষার ভারি আনন্দ হল। কিন্তু সেই সঙ্গে বন্ধুর জন্য দুঃখও হল। বেচারি ললিতা।

হঠাৎ মনে হল বুকের স্পন্দন বুঝি এবার থেমেই যাবে। ভোরের আবছায়া আলোতে দেখতে পেল কে যেন পুকুর থেকে উঠে আসছে।

হ্যাঁ, ললিতা ছাড়া আর কেউ নয়। তার হাতে পদ্মফুল। উষা একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল। ললিতা তাড়াতাড়ি টিলার উপরে চড়তে লাগল। অনেক কষ্টে কান্না চেপে, উষা তার পিছন পিছন চলল। যাকে বন্ধু মনে করত, তার এই বিশ্বাসঘাতকতায় উষার মন তিতিয়ে উঠেছিল।

পূজারী সবে ঝরণার জলে স্নান সেরে উঠে এসেছেন। এবার পূজোয় বসবেন। ললিতা তাঁর সামনে এগিয়ে দাঁড়াল। বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

"আমি। আমি একটা পদ্মফুল এনেছি।"

"পদ্ম? বাঃ, চমৎকার! তোমার নাম করে ঠাকুরকে ফুলটা দেব। তুমি উষা না? দুঃখের কথা আর কি বলব, চোখে ভালো দেখি না, কে উষা কে ললিতা গুলিয়ে ফেলি।"

ললিতা কোনো উত্তর দিল না। উষা লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মেরে সব দেখছিল। এবার আর সে কান্না চাপতে পারল না।

পূজারী আবার জিজ্ঞাসা করলেন "উষাই তো?"

হঠাৎ ললিতা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উষার নামেই ফুলটা ঠাকুরকে দিন।"

আড়াল থেকে উষা চেঁচিয়ে উঠল, "না, পণ্ডিতমশাই, ললিতাই ফুল এনেছে।"

ললিতার গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল।

"তুমিই তো ফুলটাকে খুঁজে বের করেছিলে। আমি শুধু তুলে এনেছি।"

উষার গাল বেয়ে চোখের জল বইতে লাগল। "কিন্তু ওটা তো তোমাদের সম্পত্তি।"

"তাতে কি হয়েছে?" "তুমি ছাড়া কেউ ওটা ঠাকুরকে দিতে পারে না।"

তখন আস্তে আস্তে পূজারী বাধা দিলেন। "কোনো ভাবনা নেই। দুজনের নামে ভগবানকে ফুলটা দেব। দুজনকেই আশীর্বাদ করতে তাঁর কোনো আপত্তি হবে না। দুজনেই তাঁর ভালবাসা পাবে। দুজনেই মানুষ হিসাবে আরো ভালো হয়ে উঠবে।"

বাড়ি ফেরার পথে উষা আর ললিতা এ ওর দিকে চেয়ে একটু একটু হাসতে লাগল। তাদের মনে হতে লাগল যে এর-ই মধ্যে তারা যেন আরো ভালো মেয়ে হয়ে উঠেছে। রোজকার মতো দুজনে নাচতে গাইতে লাফাতে লাগল। ঘুঘুর ছানাটার আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম জড়ানো সুরে সে আপত্তি জানাতে লাগল।